সারনিক

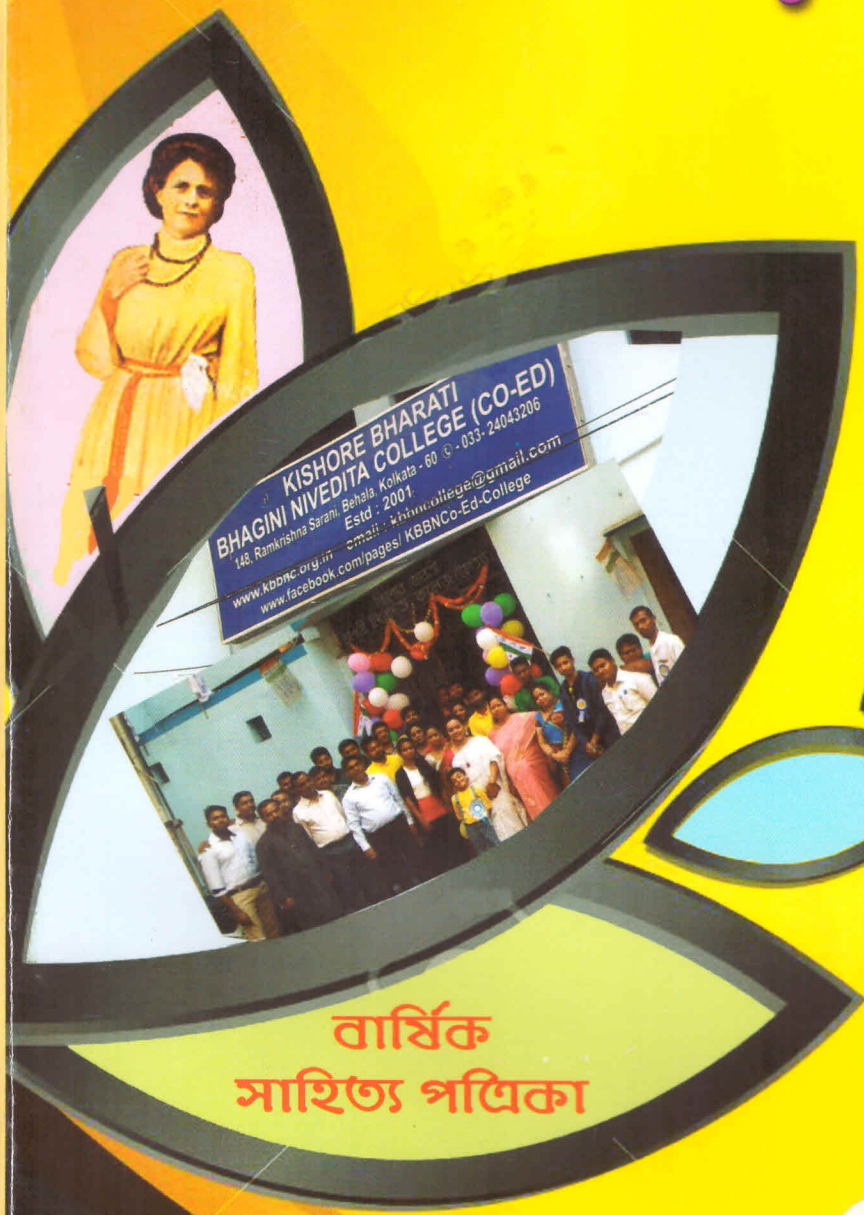

দ্বিতীয় বর্ষ
২০১৮–২০১৯

বার্ষিক
সাহিত্য পত্রিকা

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড)

সারণিক

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা কলেজ (কো-এড)

বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা

দ্বিতীয় বর্ষ

২০১৮-২০১৯

শিক্ষক সম্পাদক মণ্ডলী

সুদক্ষিণা ঘোষ

রঞ্জিনী বসু

শিপ্রা ঘোষ (আহ্বায়ক)

"স্বার্থশূন্য মানুষই বজ্র।
সেই নিঃস্বার্থপরতার সন্ধান আমাদের করতে হবে,
যাতে দেব হস্তের বজ্র হয়ে উঠতে পারি।"

- ভগিনী নিবেদিতা

সূচীপত্র

•	Message From Principal's Desk		৫
•	পরিচালন সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে		৭
•	দু-এক কথা : (শিক্ষক সম্পাদকমণ্ডীর পক্ষ থেকে)		৮
• ছবি		চম্পা দেবনাথ	
• প্রবন্ধ	কমে যাচ্ছে বই পড়া	সংযুক্তা মহলনবিশ	৯
• প্রবন্ধ	চাঁদসদাগর ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য-- একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	শ্রেয়তা সরকার	১১
• প্রবন্ধ	বিষ্ণুপুরের মন্দির – সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রবহমান ধারায়	সুতপা মুখোপাধ্যায়	১৭
• প্রবন্ধ	GLOBAL WARMING AND ITS IMPACT ON THE GLACIERS IN THE HIMALAYA	Anupriya Chatterjee	২৫
• ছবি		মৌসুমী রায়	
• প্রবন্ধ	SUPERWOMAN-CREATOR SHE IS	Megha Chakraborty	২৯
• প্রবন্ধ	পঞ্চাশের দশক : বিশ্বে এবং ভারতে নারীমুক্তির দশক	নন্দিনী রায়	৩০
• প্রবন্ধ	বিবর্তনের আড়ালে : দেবী মনসা	নীলাঞ্জনা সেন	৩৩
• ছবি		চম্পা দেবনাথ	
• প্রবন্ধ	রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : শক্তি আর ইচ্ছার মেলবন্ধন	সুদক্ষিণা ঘোষ	৩৫
• ছবি		সুপর্ণা দাস	
• প্রবন্ধ	Women Empowerment and Advertisement: A Marketing Strategy	SWEETY SADHUKHAN	৪১

সূচীপত্র

- ছবি — শ্রীতমা ব্যানার্জী
- কবিতা
  - পরিবর্তন — রুমনা সরকার
  - আহত মেঘবালিকা — সিদ্ধার্থ নন্দন
  - বৃক্ষ — অঞ্জনা সামন্ত
  - মা — শ্রীতমা দাস
  - আমার মুক্তি — শ্রেয়সী সরকার
  - আরো একবার — মুনাওয়ারা খাতুন
  - শপথ — দেবাঞ্জন বারিক
  - COUNTING — Anindita Mitra
  - SHADOWS — Anindita Mitra
- ছবি — সুন্দর দেবনাথ
  - The Frozen Beauty — Sunanda Pal
  - LIFE — Sayan Karali
  - খুকিটি আমার — প্রিয়াঙ্কা দাস
  - নীরবতা — শিপ্রা ঘোষ
  - অবিনাশী — শিপ্রা ঘোষ
- গল্প
  - অপেক্ষা — জাহাঙ্গীর শেখ
  - একাকী অন্তহীন — সৌমিকা সরকার
  - প্রিয় বন্ধু — তথাগত ব্যানার্জী

Message From Principal's Desk:

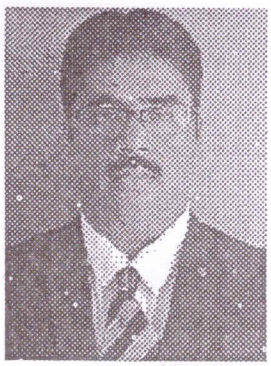

It is an immense pleasure to see the creative expressions of students and staff who have contributed to name of magazine. This college magazine is the showcase of the extracurricular activities of the college through which students teachers and non teaching staff can expose their literary and artistic talents. We believe that writing potential exists in major sections of the stakeholders, but it is the urge to write that few possess. We educators being facilitators should always promote each student to build up in their special field of interest. It is quite natural that all students do not have the same talent and so each one will achieve success in a different way. It has been our constant attempt to beat this urge by getting students and teachers to write about the things that they feel, perceive and accomplish. Let's work collectively to serve the cause of education for the betterment of the coming generation so that they live in a world where the mind is without fear and knowledge is free. This magazine has made an earnest attempt in this path and brought out positive aspects of the college to the eyes of the public so that they may appreciate and know the college even better. I am in no doubt the college will scale even better heights in the years to come and serve many more millions in the society. I applaud the editorial board on its untiring efforts in bringing out this publication of college magazine "SARANIKA". I also extend my sincere thanks to the stakeholders who have contributed to this issue and enhanced its flawlessness and beautification through their articles, short stories, poems, comics, etc.

পরিচালন সমিতির সভাপতির পক্ষ থেকে

কিশোর ভারতী ভগিনী নিবেদিতা (কো-এডুকেশন) কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে, কলেজের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা-সারণিক-এর প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

পত্রিকাটি যাতে আগামী দিনে এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-প্রতিভা প্রকাশের একটি যথাযোগ্য আধার হয়ে ওঠে, তা যেমন সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব, তেমনি সমাজভাবনামূলক গদ্যচর্চাকে উৎসাহিত করা পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব।

পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

১৬ এপ্রিল ২০১৯

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

দু-এক কথা :

আঠেরো পেরিয়েছে। তবু, সব অর্থেই, সাধ্য ও পরিসরে সীমিতই থেকে গেছে এই কলে কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা, আঠেরো উনিশের তরুণেরা, ভাসিয়ে নিয়ে যায় সীমিত সাধ্যের মধ্যে থা সব ক্লান্তি। নানামুখী উৎসাহে, প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণের স্ফূর্তি এনে দেয় তারা।

২০১৫-র পর এই ২০১৯। কলেজের সাহিত্য পত্রিকা 'সারণিক'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ হ এবার। বেশ কিছু সময়ের ছেদ মাঝখানে থাকলোই। যিনি 'পথ' বা 'সরণ' (গতি) আশ্রয় করে তিনিই 'সারণিক'। তবে পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের এই বিলম্ব অবশ্য আমাদের পথের গতি ঈষৎ স্তিমিতই করেছে। আশা করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীদের ও সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের সক্রিয় প্রয়াসে এ ব্যবধান ক্রমশ কমে আসবে।

পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা ছিলোই। কবিতা-গদ্যপ্রবন্ধ-গল্প, সব বিভাগে লেখা জমা পড়েছিল অতি অল্পই। ফলে, নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করে, যোগ্য লেখা নির্বাচন করার সুযো ছিলো না। প্রয়োজনীয় বহুল পরিমার্জনার পর, প্রায় সব লেখাকেই তাই মনোনীত করতে হয়েছে আমাদে সাহিত্যচর্চা বা গদ্যচর্চা যে অনুশীলন সাপেক্ষ এবং সেই অনুশীলনও যে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, একথা বোঝার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম ও 'নেট'দুনিয়ার ঢালাও প্রমোদ উপকরণ মহৎ সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা থেকে এদের বহুসময়ই বঞ্চিত করছে, সে কারণেই ভাষাচর্চার সচেতন 'সীরিয়স' ইচ্ছে তাদের মধ্যে জেগে উঠতে পারেই না। অতএব, কলেজ-ম্যাগাজিনের দপ্তরে যে লেখা জমা পড়ে, তা সংখ্যায় অতি নগণ্য; রাষ্ট্র-সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধের ন্যূনতা বা অভাব সেক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতোই, মনে হয়। অতএব, সেই ফাঁক ভরাট করতে এক্ষেত্রে হাল ধরেছেন কলেজের শিক্ষকেরাই। সাহিত্য-ইতিহাস ও পুরাকীর্তি, মেয়েদের কথা, পরিবেশচর্চা—ইত্যাদি নানা বিষয়ে বেশ কয়েকটি মূল্যবান অথচ নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ দিয়ে, ম্যাগাজিনের মননশীল গদ্য বিভাগে ছাত্রদের লেখার অপ্রতুলতাকে ভুলিয়ে দিতে পেরেছেন তাঁরা। ভাষায় নয়, শুধু ছবিতেই একটি বিশেষ সামাজিক বক্তব্যকেও পৌঁছে দিয়েছেন কোনো অধ্যাপক। শিক্ষকদের লেখা এবং আঁকা—শুধু যে ম্যাগাজিনের এই সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করবে তা নয়, ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গদ্যচর্চার একটি মান নির্ধারণ করে দিতে পারবে বলেও মনে হয়।

তবে, পরিমার্জন-যোগ্য হলেও, ছেলেমেয়েরা যে কবিতার মতো দুরূহ শৈলী নিয়ে ভাবছে, অন্তত নিজেদের মতো করে ছন্দে-মিলে কিছু কথা সাজিয়ে তুলতে চাইছে, এটা কম আশার কথা নয়। তেমনি কাহিনীরও একটি দিব্যি 'টান' বজায় রেখে গল্পও সাজাতে পারছে দু-একজন ছাত্র-ছাত্রী। হয়তো এই সারণিক-এর পথ বেয়েই একদিন বাংলা সাহিত্যের বড় কোনো ঘাটে নোঙর ফেলবে তারা, এমন স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখা যায়।

পরিশেষে এই পত্রিকা প্রকাশ হতে পারছে বলে, কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্র সংগঠন এবং পত্রিকার সঙ্গে সংযুক্ত সমস্ত অধ্যাপকদের আগ্রহ ও প্রয়াসের কথা মনে রেখে, তাদের ধন্যবাদ জানানো হলো।

১৬ এপ্রিল ২০১৯

শিক্ষক-সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে

শিপ্রা ঘোষ

কমে যাচ্ছে বই পড়া

সংযুক্তা মহলনবিশ
বাংলা তৃতীয় বর্ষ (প্রাক্তন)

'বই পড়া সর্বশ্রেষ্ঠ শখ' বলে একটা কথা আছে। কথা হচ্ছে 'বই পড়া' বলতে আমরা কোন্ ধরণের বইকে বুঝব। শুধুমাত্রে পাঠ্যবই নিশ্চয়ই নয়, কারণ পাঠ্যবই তো সকলেই পড়ে। ওটা তো বাধ্যতামূলক, ঠিক যেমন রোজ খেতে বসে ভাত খেতে হয়, অনেকটা তেমনি। তবে এক্ষেত্রে যদি পাঠ্যবিষয়ের বাইরের নানা বিষয়ের কথা বলা হয়, তাহলেই কথাটা ঠিক দাঁড়ায়, বরং অনেকটাই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

বই পড়া অর্থাৎ গল্পের বই পড়ার মধ্যে বেশ একটা আনন্দের, মুক্তির নিশ্বাস নেওয়ার অবকাশ থেকে যায় কোথাও। এ শুধু পড়ার আনন্দেই পড়া, মুখস্থ করতে হবে না, পরীক্ষাও দিতে হবে না, শুধু জানতে থাকার এক অনাবিল স্রোতে ভেসে যাওয়া। তাই বাঁধাধরা জীবনের মধ্যে বইপড়া একটা খুশির হাওয়া নিয়ে আসে। বই পড়া তাই খুব স্বস্তিদায়ক, তৃপ্তিদায়ক একটা শখ।

আজকাল অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সুবাদে ইন্টারনেটে হরেকরকম ই–রিডার সাইটে গল্পের বই অনলাইনেই পড়তে পারা যাচ্ছে। ক্রমশ এই পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কিংবদন্তী কল্পবিজ্ঞানবিষয়ক বই রচয়িতা আইজ্যাক অ্যাসিমভ্–এর লেখা 'আর্থ ইজ নট এনাফ্' বইয়ের একটি অংশ, যেখানে ম্যাগি তার ডায়েরিতে বিস্ময়ের সঙ্গে লিখেছে যে চিলেকোঠার ঘরে তারা একটা বই পেয়েছে, পড়ার বই। তারা কম্পিউটারেই বই পড়ে অভ্যস্ত, পড়ার বই তাদের কাছে তাই পরম বিস্ময়ের বস্তু। বইয়ের পাতা যে হাত দিয়ে ওল্টানো যায়, পাতায় যে লেখা স্থির হয়ে থাকে, এ ঘটনা তাদের অবাক করেছে, লেখকের কল্পনাশক্তি সত্যিই প্রশংসনীয়, যে তিনি এমন একটা সময়ের কথা ভাবতে পেরেছিলেন। বর্তমান প্রজন্ম যেমন রোজ বিকেলে মাঠে খেলতে যাওয়া ছেড়ে ভিডিও গেমে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে, তেমনি বই কেনার পিছনে পয়সা খরচ না করে তারা অ্যান্ড্রয়েড ফোনেই বই ডাউনলোড করে নিয়ে পড়ে ফেলছে। এতে বইয়ের দাম যেমন দিতে হচ্ছে না, তেমনি তোলাপাড়া করার, ঝাড়ামোছার ঝামেলাও নেই। এই সমস্ত সুবিধার কথা তাদের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এসব কথা সত্যি, বরং যেসব বইয়ের প্রিন্ট বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, সেইসব বইও প্রকাশনীর সাইট থেকে অনলাইনে অনায়াসেই ডাউনলোড করে নেওয়া

যাচ্ছে। এতে কোথাও বই বয়ে নিয়ে যাওয়ারও সমস্যা নেই। অতএব, হাতে করে বই পড়া আগের চেয়ে কিছুটা নিশ্চয় কমেছে। পছন্দের বই বিনা আয়াসে ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে, এ তো কম কথা নয়। সাধারণ মানুষই শুধু নন, অনেক বইপ্রেমী মানুষও আজকাল অনলাইনে বই ডাউনলোড করে পড়ছেন। তবে অনলাইনে বই পড়ার একটা অন্যতম অসুবিধা হল, এতে চোখে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এখন মানুষ ফাস্ট লাইফে--হেক্‌টিক্‌ শিডিউলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই মানুষের ধীরেসুস্থে বসে বই পড়ার অভ্যাস কমছে, তা ঠিক। ধৈর্য ধরে গল্পের বই পড়ে সময় কাটানোর বদলে মানুষ টিভি দেখতে, বা অনলাইনে ভিডিও দেখে সময় কাটাতে বেশি পছন্দ করছে।

কিন্তু এতো সাধারণ মানুষদের কথা, যারা প্রকৃত অর্থে বইপ্রেমী, আক্ষরিক অর্থে যাদের বইয়ের 'নেশা' আছে, তাদের কিন্তু বই থেকে দূরে রাখা মুশকিল। বই পড়ে অনেক কিছু জানার আনন্দ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বইয়ের নানা চরিত্রের সঙ্গে পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মিলিয়েও নিতে পারেন। বইপ্রেমীদের কাছে বই শুধু আনন্দেরই নয়, মুক্তিরও উপায়, মনখারাপ থাকলে কেউ কেউ বই নিয়ে বসে পড়েন।

তাই আজকাল বই পড়ার অভ্যাস হয়তো কমেছে, কিন্তু তা পরিসংখ্যানের দিক থেকে। যাঁরা বই পড়তে ভালোবাসেন, তাঁদের ক্ষেত্রে একথা কখনোই খাটেনা। আজও কলকাতা বইমেলা বা কলেজ স্ট্রীট বইপাড়ায় গেলে এমন প্রচুর বইপ্রেমীর দেখা মিলবে। ছোটোখাটো বইমেলাতেও একই চিত্র দেখা যাবে। কলেজ স্ট্রীটে বই-মগ্ন পাঠকের চিত্র একসময় একটি সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্রিকায় দেখেছিলাম, এখনো সে ছবিটি মনে আছে। চারিদিকে রাশি রাশি বই, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কিছু মগ্ন পাঠক! তাই বইয়ের প্রতি যাঁদের গভীর ভালোবাসা আছে, তারা কখনোই বই-কে ভুলে থাকতে পারবেন না, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খবরের কাগজে এখনও মাঝে মাঝে এমন কিছু বইপ্রেমীর কথা প্রকাশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজনের কথায় পড়েছিলাম যে, যাঁরা দূরদূরান্ত থেকে তাঁর লাইব্রেরিতে আসেন, তাঁদের নাকি তিনি রাতে থাকতেও জায়গা দেন! বইয়ের সঙ্গে যাঁদের প্রাণের সম্পর্ক, তাঁরা কিন্তু এখনো বই পড়েন, পরেও পড়বেন। অনলাইনে বই পড়ার অভ্যাস তো থাকবেই, প্রযুক্তি উন্নত হলে এসব অভ্যাস তৈরি হবেই। কিন্তু বই পড়াও থাকবে। আজও যে কেউ বইয়ের পাতায় চোখ রেখে, বইকে ভালোবেসে বলতেই পারেন, "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে!"

চাঁদসদাগর ও আধুনিক বাংলাসাহিত্য--
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

শ্রেয়তা সরকার *(বাংলা দ্বিতীয় বর্ষ)*

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' ও শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি'র মধ্যে অন্তর্লীন সম্পর্ক খুঁজে দেখাই আমার লেখাটির উদ্দেশ্য।

শম্ভু মিত্রের, 'চাঁদ বণিকের পালা'র কাহিনিতে এমন একটি আবেদন, এমন এক যুদ্ধ আছে সেই যুদ্ধটা আমরা সবাই চাঁদের কাছ থেকে হাত পেতে নিতে পারি। এই যুদ্ধ চাঁদের নিজের সঙ্গে নিজের। এই যুদ্ধ যা কিছু অন্ধকার–যা কিছু অসত্য–সেই অন্ধকার, অসত্যের জাল ছিঁড়ে আলো ও সত্যকে জয় করার যুদ্ধ। আর এখানে সত্যই হল শিবাই আর অন্ধকার হল মনসা। শিবাইয়ের উপাসকের সঙ্গে মনসা–র দ্বন্দ্ব এই পালার মূল বিষয়।

এখানে মনসা দৈবী শক্তির অধিকারিণী হওয়ায় সে নানান অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারে। চাঁদ তা পারে না। চাঁদের শরীরের সীমা আছে। আর তাই তো সে অসীমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে সক্ষম। চাঁদ মনসাকে অর্থাৎ অন্ধকারকে প্রতিহত করেছে কারণ সে শৈব অর্থাৎ সত্যের উপাসক।

এখানে চাঁদ বণিকের কাহিনিটি কোনো ধর্মীয় বৃত্তের মধ্যে নেই। 'চাঁদ বণিকের পালা'য় আমরা বণিক চাঁদ সওদাগরকে এমন এক অনমনীয় দৃঢ় চরিত্রে পাই যেখানে অন্ধকার অর্থাৎ মনসা তার শক্তি প্রয়োগে চাঁদের সর্বস্ব--দাম্পত্য বা প্রেম, বাৎসল্য, সন্তান, মহাজ্ঞান--এক অর্থে এইসব পার্থিব কিছু হরণ করে নেয়, তাও চাঁদ তার শিবত্বকে ছাড়ে না। এই শিবত্বই তার কাছে জীবনের এক নাম। সে মহাজীবন, মহাধর্ম বলে কিছু বোঝে না। সে শুধু শিবত্ব বোঝে। শম্ভু মিত্রের নাটকে এই শিবত্বই বার বার বুঝিয়ে দেয় সত্যি আর সত্যের পার্থক্য। সত্যি অনেক কাছের, সত্য অনেক কঠিন, যে সত্যকে সে ধরে রাখে, সে সত্য কঠিন। তাকে ধরে থাকাটাও কঠিন। তবুও সে সত্যকে কঠিন রূপেই ভালোবাসে। তার এই ভালোবাসার জন্যই তাকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়, হয়তো সবকিছুই; তবুও একথা মেনে সে সত্যের উপাসক, শিবত্বই তার জীবনের মূলমন্ত্র। সত্যের অনুসন্ধানই তার জীবনের মূল লক্ষ্য।

আমরা কিছু অল্প কিছুকে পাওয়ার জন্য খুব বড়ো কিছুকে খুব সহজেই নির্দ্বিধায়

ছেড়ে দিই অনেক সময়--যা কিছু শিখেছি, ভেবেছি, অর্জন করেছি, যা ভালোবাসি তা সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি। আমরা পারলেও চাঁদ তা পারেনা। কারণ সে সত্যের, কঠিনের উপাসক, সে পার্থিব কিছুর জন্য সত্যকে ছাড়ে না। এখানেই চাঁদ সবার থেকে আলাদা। চাঁদের মধ্যে আছে একটা অনপনেয় বিষণ্ণতা। চাঁদ যখন সত্যের জন্য অতটা পথ হাঁটে তখন সে তার পার্থিবকে হারায়--স্ত্রী সনকা, বন্ধুজন, সন্তান, এমনকি সন্তানও তাকে প্রশ্ন করে, দায়ী করে, সে একা হয়ে পড়ে।

চাঁদ-সদাগরের এ যাত্রা কীসের উদ্দেশ্যে যাত্রা?--এ যাত্রা চম্পক নগরী থেকে কালীদহ পার হয়ে অন্য কোনো পার্থিব নিয়ে ফিরে আসার ভৌগোলিক যাত্রা নয়, তার চেয়েও বড়ো কিছু। এ যাত্রা এক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের, চাঁদ যে যাত্রার ইঙ্গিত পাচ্ছে তার রক্তে। নিজের রক্তে যাত্রার কলরোল শুনে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করে কালীদহ ছুঁয়ে অন্য কোথাও মহত্তর যাত্রা করে চাঁদ। আরেক অর্থে বলা যায় এই যাত্রা ন্যায় থেকে ন্যায়ে, সত্য থেকে সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা, আর তার মাঝখানে কালীদহ। চাঁদ সদাগরের ধরে থাকা এই দৃঢ় সত্যই হল হেতালের লাঠি। এই হেতালের লাঠিরূপী সত্যের সাহায্যেই সে ফণা অর্থাৎ অন্ধকারকে প্রতিহত করতে চায়। কারণ সে চায় না, তার উত্তর প্রজন্মকে কোনো অন্ধকার গ্রাস করুক, তাই শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি' কবিতাটি বলে--

হেতালের লাঠি নিয়ে বসে আছি লোহার সিঁড়িতে
কালরাত্রি কেটে যাবে ভাবি, ওরা বাসর জাগুক
এমন রাত্রিতে কোনো ফণা এসে যেন না ওদের
শিয়রে কুন্ডল করে, কেটে যাক প্রেমের প্রহর।

এবার আমরা আসি চাঁদের এই বিকল্পহীন সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথের প্রতিবন্ধকতার কথায়। চাঁদ ইতিহাসের ডাক শুনে বেণীনন্দনের শর্ত, অসম্মতিকে উপেক্ষা করে যাত্রা শুরু করে। বেণীনন্দন বাণিজ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সে প্রচার করেছে তার সম্মতি না মিললে, তার শর্ত না মেনে যেন কেউ চম্পক নগরী থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা না করে, এখানে বেণীনন্দন রাষ্ট্র, রাজনীতি, এক অর্থে স্পষ্টই দুর্নীতির মূর্ত প্রতীক। বেণীনন্দন চম্পক নগরীর মান্ডলিক। আবার মান্ডলিকের ওপরে আছেন মহামান্ডলিক বল্লভাচার্য। ইনি চাঁদ বণিকের শিক্ষক। চাঁদ সারাজীবন ধরে যা কিছু ন্যায়, যা কিছু সত্যের, তাৎপর্য শিখে এসেছিল বল্লভাচার্যের কাছ থেকে। কিন্তু আজ যখন চাঁদ সেই সত্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তখন বল্লভাচার্য বেণীনন্দনের

গলায় গলা মিলিয়ে হয়ে ওঠে চাঁদের পথের প্রতিবন্ধক। কেন বল্লভাচার্যকে বেণীনন্দনের গলায় গলা মেলাতে হয়? অন্যায়, অন্ধকার, দুর্নীতির সঙ্গে আপোস করতে হয়?—কারণ দরিদ্র-ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্য সারাজীবন ধরে পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করেননি। তাঁর ঘরে অসুস্থ স্ত্রী, যক্ষ্মারোগী, স্ত্রীর পথ্য জোগাড়ের সম্বলটুকু নেই। তাঁর বড়ো ছেলেও এক মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণ খুইয়েছে। এইসব তাঁকে বেণীনন্দনের হাত ধরতে বাধ্য করে। আবার চাঁদের যাত্রাপথে কালীদহের ঝড় ওঠে। কালীদহ একটি হ্রদ। এখানে এই কালীদহ নামক হ্রদটিকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। সত্যের জন্য যে অভিযান, তাকে ব্যাহত করে কালীদহের ঝড়। এই ঝড় দিগন্তকে ছুঁয়ে ফেলে। এই ঝড়কে অস্বীকার করার কথা চম্পক নগরী অর্থাৎ সমাজ ভাবে না। এখানেও চাঁদ সবার থেকে আলাদা। কালীদহে ঝড় ওঠে। আর কালীদহে ঝড়ের মুহূর্তটাই ঘূর্ণাচক্রে। যখন চাঁদ ডিঙা নিয়ে যাত্রা করছে, তার অনুচরদের মধ্যেও কিন্তু অনেক সন্দেহ, অনেক সংশয়। তখন চাঁদের মনে হয় যারা তার অনুচর, যারা বন্ধুজন তারা যদি চাঁদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হয় তাহলে সে তো তার সহযাত্রীও নয়।

আবার অন্যদিকে সে যখন ঘরে ফেরে, তখন দেখে তার সহধর্মিণী সনকা অন্য কোথাও খুব গোপনে মনসার পূজা করছে। চাঁদ যেখানে শিবাই সমর্থক সেখানে সনকা মনসার পূজা করছে। কিন্তু এমন তো বাধ্যবাধকতা নেই যেখানে স্ত্রীকেও স্বামীর মতোই শিবাই সমর্থক হতে হবে। তাহলে এক্ষেত্রে অর্থাৎ তার দাম্পত্যের ক্ষেত্রেও তার স্ত্রী তার সহযাত্রী নন, তার বিশ্বাসে বিশ্বাস অর্পণ করেননি।

তার ছয় পুত্র মৃত। তাদের কলার মান্দাসে ভাসিয়ে সে যাত্রা করেছে। চারিদিকে তখন বেণীনন্দনের শাসানি, বল্লভাচার্য তার গুরু কিন্তু বল্লভাচার্যকেও মেলাতে পারে না তার সেই চিরকালের গুরুর সঙ্গে।

অর্থাৎ চাঁদ তার বন্ধু, অনুচর, শিক্ষক এমনকি তার অর্ধাঙ্গিনীর সাহচর্য পায়না তার এই যাত্রাপথে। তাই তো চাঁদ তার সত্যটাকে এত আঁকড়ে ধরে। তার মনে হয় এই চক্রান্তের অন্ধকারে শিবাই একমাত্র সত্য, একমাত্র আলো। ধর্মীয় বৃত্তের বাইরে এসে যদি আমরা বিষয়টাকে দেখি, তাহলে মনসা কোনো দেবী নন, সাপও নয়, মনসা অন্ধকারের, অসত্যের প্রতীক। চাঁদ যখন দেখে তার বন্ধু, অনুচর, শিক্ষক, স্ত্রী সবাই অন্ধকারের সঙ্গে আপোস করেছে, তখন চাঁদের মনে হয় সে যে সত্যটাকে এতদিন ধরে আছে, যে সত্যের জন্য তার চারপাশে এত বাধা, ছোটত্ব, এত বিরুদ্ধাচরণ, সেই সত্যটাকে চাঁদকে ধরে রাখতে হলে আরো দৃঢ়মুষ্টি হতে হবে। তাই তো তা ধরে রাখার

জন্য চাঁদ এত অদম্য। চাঁদ যখন একটা বিন্দুতে দাঁড়িয়ে দেখে যে সে যা কিছু শিখেছিল, যা কিছু ভাবে, তার সেই শেখা, ভাবনাকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য এতরকম প্রলোভন, এতরকম না-এর হাতছানি। চাঁদ জানে না এই সত্যকে ধরে রাখতে হলে তাকে আরো কতখানি দৃঢ়মুষ্ঠি হতে হবে। আর এই দৃঢ় পৌরুষের প্রতীক এই হেতালের লাঠি, কিন্তু হেতালের লাঠি থাকা সত্ত্বেও তাকে এত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়, আর এই প্রতিবন্ধকতাই শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি' কবিতায় ঘুম হয়ে দেখা দেয়--

কিন্তু বড়ো ঘুম, এক কালঘুম, মায়াঘুম যেন
কেবলই জড়ায় চোখ, অবসাদে ভরে দেয় শিরা

এরপর চাঁদ যখন সমস্ত অপহৃত হয়ে চোরের বেশে বাণিজ্য থেকে ফিরে আসে তখন চাঁদের সামনে দুটো প্রশ্ন--এক--তাহলে সে গিয়েছিল কেন? জয় হল না কেন? জয় যদি না হয় এবার তার করণীয়টা কী? দুই--চাঁদের সামনে তখন লখিন্দর। সে তার এই প্রত্নপুরুষকল্প পিতাকে প্রথম দেখেছে। এতদিন সে তার পিতার কথা শুধুমাত্র শুনে এসেছে। আর শুনেছে মা সনকার অবৈধ মাতৃত্বের কলঙ্কের কথা। লখিন্দরের জন্মবৃত্তান্তের সত্যতা যাচাইয়ের প্রশ্নে চাঁদ কী উত্তর দেবে?

আর লখিন্দরের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন কী তার জন্ম পরিচয়। সে সমাজে কর্তৃক শোনে তার প্রত্নপুরুষকল্প পিতার অনুপস্থিতিতে নাকি বেণীনন্দনের সঙ্গে তার মা সনকার অবৈধ সম্পর্কের জেরেই তার জন্ম। এখানেই সে এক পরীক্ষার সম্মুখীন, তার রক্ত যদি তাকে কালীদহের ঝড়কে উপেক্ষা করে সমস্ত প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে যাত্রা করার প্ররোচনা দেয়, আর সে যদি তার রক্তে ইতিহাসের ডাক শুনতে পায় তাহলে সে তার প্রত্নপুরুষকল্প পিতার রক্তে গড়া, তার জন্মবৃত্তান্তে অবৈধতার লেশমাত্র নেই। আর তা না হয়ে সে যদি অন্ধকার, দুর্নীতি, খল, কপটতাকে স্বীকার করে তাহলে তার রক্ত বেণীনন্দনের। অর্থাৎ লখিন্দরের চারপাশেও তখন কালীদহের ঝড়--কানীর চক্রান্ত, ফল হিসাবে লখিন্দর যাত্রাই চেয়েছিল।

এই দুর্গম পরিস্থিতিতে চাঁদ দৃঢ়মুষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যখন বন্ধু পরিজন, স্ত্রী সবাই তার থেকে বিচ্ছিন্ন, বিশেষত যখন তার পুত্র তাকে প্রশ্ন করে তখন সে সামান্য হলেও এই সমস্ত প্রশ্নে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শঙ্কিত হয়।

সমস্ত চেতনাঘেরা নাগিনীপিচ্ছল অন্ধকারে
ঢিল হয়ে আচে মুঠি, খসে আসে হেতালের লাঠি।

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা'য় আমরা লখিন্দরকে সেই গতানুগতিক ভূমিকায় পাই না। আমরা তাকে পাই এক সক্রিয় ভূমিকায়। এখানে সে কোনো মৃত অস্তিত্ব নয়, লখিন্দরের কথাটা এখানে খুব বড়ো কথা। এখানেও লখিন্দরের বিবাহ হবে মৃত্যুও হবে। কিন্তু অন্যভাবে। আর এখানেই শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' আলাদা হয়ে যায়।

এখনো চাঁদ আশা রাখে তার সেই শেষ জ্বলন্ত প্রদীপ লখিন্দরকে নিয়ে। সে ভাবে সে হয়তো এই লখিন্দরের মাধ্যমেই তার উত্তর প্রজন্মের রক্তে বুনে দিয়ে যাবে ইতিহাসের স্বপ্ন, ঝড়, প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা, যা কিছু অন্ধকার এই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করার সাহস, সত্যকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা, তাই হেতালের লাঠি নিয়ে চাঁদ রাত জাগে। যাতে তার সন্তানের তীব্র প্রেমের মুহূর্তে আরো কোনো সন্তান–সন্ততির জন্ম হয়, সৃষ্টি হোক উত্তর প্রজন্ম। যে প্রজন্মের মধ্যে তারা রেখে যেতে পারে তাদের অস্তিত্ব। যে উত্তর প্রজন্ম একদিন সত্যের কথা বলবে, সত্যের অন্বেষণ করবে। তাই চাঁদ চায় তার উত্তর প্রজন্মের ঘরে যেন না কোনো পাতালের অন্ধকার ঢুকতে পারে। তার বিগত ছয় পুত্রের মতো লখিন্দরকেও যেন কোনো অন্ধকার গ্রাস না করে। তাই চাঁদ নিজেই হেতালের লাঠি নিয়ে বসে থাকে পাহারাতে। এই নির্বিকল্প সত্যই হল হেতালের লাঠি! চাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল, ভাবি প্রজন্মের কাছে সত্যের স্বপ্ন বুনে যাওয়া। আর এই একই অর্থ প্রকাশ করছে শঙ্খ ঘোষের 'হেতালের লাঠি' কবিতাটির এই অংশটি––

তারও মাঝখানে আমি স্বপ্নের ভিতর স্বপ্ন দেখি
দেখি ওরা হেঁটে যায় পৃথিবী সুন্দরতর করে
নক্ষত্রেবিলাসে নয়, দিনানুদিনের আলপথে
আর যতদূর যায় ধানে ভরে যায় ততদূর
আমি শুধু এইখানে প্রহরীর মতো জেগে দেখি
যেন না ওদের গায়ে কোনো নাগিনীর শ্বাস লাগে
যেন কোনো ঘুম, কোনো কালঘুম মায়াঘুম এসে
শিয়র না ছুঁতে পারে আজ এই নিশীথনগরে
হেতালের লাঠি যেন এ কালপ্রহরে মনে রাখে
চম্পকনগরে আজ কাণীর চক্রান্ত চারিদিকে।

লখিন্দর পর্বে এসে শম্ভু মিত্রের পালাটি আরেকটি যাত্রার কথা বলে। বেহুলার সাথে তার যেদিন বিয়ে হয় সেই রাতেই কালনাগিনীর দংশনে তার মৃত্যু। এই চেনা ছন্দের পতন ঘটল শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বনিকের পালায়'। আর লখিন্দর এই যে যাত্রার কথা বলে তা কীসের যাত্রা? সে যাত্রা বাবার সত্যের উদ্দেশ্যে করা যাত্রাকে সফলতা দানের যাত্রা। কারণ সে দেখে তার বাবা যিনি সারাজীবন ধরে সত্যের উপাসনা করে এসেছেন, যিনি এত প্রতিবন্ধকতা, এত প্রতিকূলতা, এত সব পার্থিবকে হারানোর মাঝেও কখনো অন্ধকারের সঙ্গে অসত্যের সঙ্গে আপোস করেননি, তাঁকে আজ শুধুমাত্রে সন্তানের প্রাণের প্রশ্নে অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বাঁ হাতে মনসাকে ফুল দিতে হয়। পরোক্ষভাবে হলেও অন্ধকারের সাথে আপোস করতে হবে। এটাই লখিন্দর মেনে নিতে পারে না। এই মিথ্যের ভার তার কাছে বিষের সমান। চাঁদসদাগরের পরাজয় দেখতে রাজি নয়। আর তাই চাঁদকে চিরজয়ী করার লক্ষ্যে লখিন্দর আর বেহুলা এই পালায় আত্মহননের সিদ্ধান্ত নেয়। নিজের প্রাণের বিনিময়ে সন্তানেরা পিতার লড়াইকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যায়। এইখানেই 'চাঁদবনিকের পালায়' চাঁদ চরিত্রের জয় বা পরাজয়।

বিষ্ণুপুরের মন্দির — সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের প্রবহমান ধারায়

সুতপা মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ভারতীয় ইতিহাস চর্চার ধারায় সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির গতিবিধি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে স্থাপত্য ভাস্কর্য উপাদান হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেই ধারাতে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে সময়ের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলার মন্দিরগুলি। মন্দির শিল্পে প্রাচীন বাংলায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল বর্তমান বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর। মোঘল আমলে দিল্লি থেকে দূরবর্তী হওয়ার সুবাদে এবং দুর্গমতার ঘেরাটোপে নিজের অবস্থানকে নিশ্চিত করে একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা প্রবহমান রাখতে পেরেছিল বিষ্ণুপুর, যার প্রভাব সঙ্গীত ও মন্দির নির্মাণ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে। নান্দনিক বোধে উত্তরণের যে প্রক্রিয়া সেটি মন্দির নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে ভাবধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় মন্দির গাত্রের প্যানেলে। মন্দিরগুলি নির্মাণের মধ্যে নথিভুক্ত হয়ে আছে একটি জনপদের সমৃদ্ধির কাল, তার অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া।

কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে, ভৌগোলিক দুর্গমতার ওপারে অবস্থানের কারণে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বিকাশের জায়গা পেয়েছিল বিষ্ণুপুর। বহির্জগতের সঙ্গে মেলামেশা যে হয়নি তেমন কিন্তু নয়। রাজনীতি, ধর্ম সংস্কৃতি সবক্ষেত্রেই উত্থান-পতনের প্রবহমান ধারায় মিশে ছিল বিষ্ণুপুর আর তৈরি করে নিতে পেরেছিল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যার প্রতিফলন সঙ্গীত এবং মন্দির নির্মাণ শিল্পে সবচেয়ে উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়েছিল। ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যে বাংলায় যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সেগুলিকে পাঠ করার যে প্রয়াস তারই পরতে পরতে খুলতে থাকে ইতিহাসের নানা সময়, সেই সময়ের গল্প। বাংলার প্রতিটি মন্দির নির্মাণের প্রেক্ষাপটে লুকিয়ে আছে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির নানা ছবি। মন্দির ধরে রেখেছে সমৃদ্ধি বা অবক্ষয়ের হিসেব-নিকেশ।

বাংলার প্রেক্ষাপটে চৈতন্য আন্দোলন মন্দির নির্মাণ শিল্পে তার বিশেষ প্রভাব

রেখেছে। ষোড়শ শতকে বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার এক নতুনতর প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এসেছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের ধারাটিকে। বনবিষ্ণুপুরে মল্ল শক্তির উত্থান, অরণ্য অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলের কৌম প্রধানদের ভৌমিক সীমানা বিস্তার এবং উচ্চবর্ণে তাদের উত্তরণের প্রক্রিয়া নানাভাবে আলোড়িত করে সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশকে। সমগ্র ভারতেই ষোড়শ শতকের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দৃঢ়ীকরণ নিয়ে আসে স্থায়িত্ব যার প্রভাব পড়ে সাংস্কৃতিক জীবনেও। মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বিষ্ণুপুর তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে নিজস্ব যে সাংস্কৃতিক ধারাটি প্রবাহিত করতে সমৃদ্ধ হয়েছিল তার পশ্চাতেও ছিল রাজকীয় ক্ষমতার দৃঢ়বদ্ধতা, কর আদায়ের নিয়মিত ব্যবস্থা, শান্তি–শৃঙ্খলার সুষ্ঠু পদক্ষেপ। শ্রীনিবাস আচার্যের বৃন্দাবন থেকে বিষ্ণুপুরে আগমনের পূর্ব থেকেই নিত্যানন্দ প্রবর্তিত খড়দহ কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা বাংলার অন্যান্য অংশের মতো মল্লভূমকেও প্রভাবিত করেছিল। এর প্রভাব দেখা যায় বিষ্ণুপুরের বাইরে বীরসিংহ গ্রামে ১৪৪ মল্লাব্দ বা ১৬৩৮ খ্রীঃ মল্লরাজাদের নির্মিত শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্য–পূর্ব বৈষ্ণব ধর্ম এই অঞ্চলে শক্তি উপাসনার পাশাপাশি প্রভাব বিস্তার করেছিল আগেই। ডেভিড ম্যাক্কাচিয়ন লেখেন—Nearly all the surviving richly decorated temples and terracota decoration is Vaishnava not merely in subject matter, but in spirit.

ষোড়শ–সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি ঐশ্বর্যের অভিব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মন্দির স্থাপত্য ও টেরাকোটা ভাস্কর্য হয়ে ওঠে এক উন্নত শিল্পের প্রকাশ। প্রধানতঃ পাঁচ ধরণের শৈলীতে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল—শিখর শৈলী, জোড়বাংলা, একরত্ন, পঞ্চরত্ন এবং নবরত্ন। তবে চালা রীতি বাঙালীর নিজস্ব স্থাপত্য ভাবনার ফসল যা বিশিষ্টভাবে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ থেকে উনিশ শতকে প্রধানতঃ মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মন্দির নির্মাণের ব্যাকরণ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও বাংলায় শিল্পীরা নিজের ব্যাকরণ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাই উড়িষ্যার শিখর শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েও শেষ পর্যন্ত সাধারণ বাসগৃহের যে চালা রীতি তাকেই মন্দির স্থাপত্যে মুখ্য করে তুললেন শিল্পীরা।

মল্লরাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে যে মন্দির স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাসমঞ্চের কথা। এল.এস.এস. ও'ম্যালি মল্ল রাজাদের যে কালানুক্রম নির্দেশ করেছেন সে অনুযায়ী বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল ছিল ১৫৯১– ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ।[১] আবুল ফজল 'আকবরনামা'–তে

১. এল.এস.এস.. ও'ম্যালি---বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স - বাঁকুড়া, পৃ. ২৮।

তাঁকে মুঘলদের প্রতি বন বিষ্ণুপুরের অনুগত জমিদার হামির বলে উল্লেখ করেছেন। ওড়িশার লোহানী আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘল অভিযানে তিনি মুঘলদের বিশেষভাবে সাহায্য করেন। বীর হাম্বিরের রাজত্বকালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হ'ল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তাঁর দীক্ষাগ্রহণ। বিষ্ণুপুরের সমাজ–সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব গভীর। ভক্তিবাদ প্রভাবিত করেছিল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেও যা ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ ও বৈষ্ণবধর্মে মনোনিবেশ আপাতভাবে রাজকীয় ত্রুটিগুলিকে ঢেকে দেওয়ার প্রয়াসে সহায়ক হয়েছিল। বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ অবশ্যই নান্দনিক ক্ষেত্রেটিকে প্রভাবিত করেছিল। আনুমানিক ১৫৮৭ সালে বীর হাম্বিরের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয় পিরামিড সদৃশ রাসমঞ্চ। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে এটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান। চতুর্দিকে প্রায় দশ ফুট প্রশস্ত চাতালের মধ্যস্থলে চাতাল থেকে আট ইঞ্চি উচ্চতায় নিখুঁত বর্গাকার বেদীর উপরে রচিত হয়েছে পিরামিড আকৃতির এই অভিনব মঞ্চটি। মঞ্চের বহির্ভাগে বা প্রথম সারিতে স্তম্ভের সংখ্যা চল্লিশ। ঊর্দ্ধাংশে উভয় দিকে ক্রমবিস্তার লাভ করে পাশাপাশি দুটি স্তম্ভ একত্রিত হয়ে যৌথভাবে রচনা করেছে কারুকার্য বিশিষ্ট এক একটি সুদৃশ্য খিলান। এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকও রচিত হয়েছে। চতুর্থ স্তবকে আছে উপগৃহ যার প্রবেশপথ শুধু দক্ষিণ দিকের তিনটি দরজা। সঙ্কীর্ণ এই দরজা পেরিয়ে আসা যাবে গর্ভগৃহের কাছে। মঞ্চটির বহির্ভাগের দরজাগুলির উপরে কার্ণিশ বরাবর বাংলার চালা রীতির অনুকরণে নির্মিত হয়েছে মোট কুড়িটি গম্বুজ। এর গা ঘেঁষে নির্মিত হয়েছে পিরামিড চূড়ার প্রথম ধাপ। সর্বোচ্চ ধাপের ছোট চৌকো বেদীর উপর নির্মিত হয়েছে অর্ধবৃত্তাকার একটি গম্বুজ। রাস উৎসবের জন্যে খ্যাত ছিল রাসমঞ্চ। রাঢ় অঞ্চলের গবেষক মাণিকলাল সিংহের মতে রাঢ়বাংলায় যাত্রা উৎসবের সূচনা সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরেই প্রথম এবং প্রাকৃত তথা বাংলা ভাষায় প্রথম অভিনয় হয় এখানেই।

১৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যবর্তী সময় ভারতের আর্থ–রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বদলের সময়কাল। এই দুশো বছরে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটেনে এশিয়ার উৎপন্ন জিনিসের বাজার তৈরি করতে সক্ষম হয়। বিপুল পরিমাণ আমেরিকান রুপো কোম্পানি এশিয়ার বাজারে নিয়ে আসে। ব্যবসার সুরক্ষায় তারা তৈরি করে নিতে থাকে নিজেদের জায়গা। ১৬৬০ থেকে ১৬৮০–র মধ্যে বাংলায় কোম্পানির ব্যবসা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৬৯০ সালে সুতানুটি ও সংলগ্ন গোবিন্দপুর আর ডিহি কলকাতা কেনেন জব চার্নক। ভারতের বৃহত্তম প্রেক্ষাপটে এই পটপরিবর্তনের সূচনায় বিষ্ণুপুরও প্রবাহিত হতে থাকে রাজনীতি–সমাজ– সংস্কৃতির আবর্তে। ১৬২৭ সালে

প্রথম রঘুনাথ সিংহ যখন বিষ্ণুপুরের শাসক হন তখন মল্লভূমের রাজনৈতিক চরিত্রে পরিবর্তিত হচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে তার নিশ্ছিদ্র স্বতন্ত্রতা। মল্লভূম বাংলার মুঘল সুবাদারের অধীনে পরিণত হচ্ছে Tributory State-এ। মল্লরাজ পেশকশী জমিদারে পরিণত হন যিনি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্যে ইচ্ছেমত রাজস্ব প্রদান করতে পারতেন। এই প্রথা মুর্শিদকুলী খাঁর বাংলার নবাব থাকার সময় পর্যন্ত চলেছিল। রাজস্ব আদায় করার জন্যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি সম্ভবত এই কারণেই যে সংগ্রহের খরচ হয়তো সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ থেকে বেশিই হয়ে যেত। তবে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মল্লভূম তার স্বতন্ত্রতা অনেকখানিই বজায় রাখতে পেরেছিল।

১৬৪৩ সালে প্রথম রঘুনাথ সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্যামরাই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সময়ে বিষ্ণুপুর মন্দির নির্মাণ শিল্পে বিশেষ অগ্রণী হয়ে ওঠে। এইসময় থেকে মল্লরা সিংহ উপাধি গ্রহণ করে থাকে এবং বহির্ভারতে যোগাযোগ ক্রমশঃ তাদের গৌরব বৃদ্ধিতে উৎসাহী করে তোলে। বৈষ্ণবধর্মে বিশ্বাসী হলেও ক্ষত্রিয় মর্যাদা লাভের বাসনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মোড়কে রাজকীয় ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে শাসকদের উৎসাহিত করে তোলে। প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময়ে মল্লভূমে যে সমৃদ্ধি আসে তারই প্রকাশ ঘটে মন্দির নির্মাণ শিল্পে। পঞ্চরত্ন, জোড়বাংলা ও একরত্ন মন্দিরগুলি নির্মিত হয় তাদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে। জটিলতর নির্মাণ কৌশলে তৈরি হয় শ্যামরাই–এর মন্দির! নীচু একটি বর্গাকার বেদীর উপর এই মন্দিরটির অবস্থান। নিম্নাংশের আচ্ছাদনের উপর ঊর্দ্ধাংশের পাঁচটি রত্নের সজ্জা। কেন্দ্রীয় রত্নটির আসন অষ্টকোণাকৃতি। পার্শ্বরত্নগুলি উচ্চতায় প্রায় কেন্দ্রীয় রত্নটির সমান। পঞ্চরত্ন মন্দিরচর্চা বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হলেও ক্রমশঃ বিষ্ণুপুরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৬৫৫ সালে প্রথম রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক নির্মিত হয় অনন্য সাধারণ জোড়বাংলা মন্দির যা স্থানীয়ভাবে কেষ্ট রায় নামেও পরিচিত। দুটি কক্ষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিন্যাসে নির্মিত জোড়বাংলা। অভ্যন্তর বিন্যাস, আচ্ছাদন গঠন, অলংকরণ রচনা সবকিছু মিলে জোড়বাংলার একটি সুসংহত রূপকল্পনা ফুটে ওঠে। ১৬৫৬ সালে একরত্ন শৈলীতে নির্মিত হয় কালাচাঁদ মন্দির। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হ'ল মন্দিরের শীর্ষে একটি সুদৃশ্য চূড়ার অবস্থান। অপর একটি একরত্ন মন্দির ১৬৬৫ সালে দ্বিতীয় বীর সিংহের পত্নী শিরোমণি দেবীর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয় মদন গোপাল মন্দির। পোড়া ইঁটের তৈরি একরত্ন মন্দির হিসেবে মদনমোহন মন্দিরটি ১৬৯৪ সালে নির্মিত হয় রাজা দুর্জন সিংহের সময়। ১৭২৬ সালে রাজা গোপাল সিংহ নির্মাণ করেন জোড় মন্দির। ১৭৩৭ সালে রাজা কৃষ্ণ সিংহের পত্নী

চূড়ামণি দেবী নির্মাণ করেন রাধামাধব মন্দির।

১৬৫৭ সালে প্রথম রঘুনাথ সিংহের পর তাঁর পুত্র বীর সিংহ ১৬৫৭ সালে সিংহাসনে বসেন। পিতার রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার ছাড়াও পার্শ্ববর্তী চন্দ্রকোণাকে মল্লরাজ্যভুক্ত করেন তিনি। তাঁর রাজত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শাহসুজার মল্লভূম আক্রমণ। ৫৯,১৪৯ টাকা বিষ্ণুপুরের পেশকস হিসেবে ধার্য করা হয় (James Grant : Views of the Revenue of Bengal; Appendix to the Fifth Report, Vol, II ed. By W.B. Firminger ; Cal. 1917, p. 394)। বীর সিংহের পরে দুর্জন সিংহের সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ১৬৯৬ সালে শোভা সিংহের বিদ্রোহ। শোভা সিংহ আফগান সর্দার রহিম খাঁর সঙ্গে যুক্তভাবে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে যোগদান করেন দুর্জন সিংহের পুত্র রঘুনাথ সিংহ। ডি.কে. মুখার্জী তাঁর প্রবন্ধ "The Annals of Burdwan Raj"–এ দেখিয়েছেন যে মল্লরাজারা শোভা সিংহের বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। এই সময়ে বর্দ্ধমান জমিদারির ক্রমবর্ধমানতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসকদের প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল। ১৭০২ সালে রঘুনাথ সিংহের ক্ষমতা লাভের সময়ে ভারতীয় কেন্দ্রীয় রাজনীতিও পটপরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে মনোনিবেশ এবং বাংলায় কার্যতঃ মুর্শিদকুলি খানের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ার সূচনা। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাংলা কার্যতঃ মোঘল কর্তৃত্বের আওতা থেকে বেরিয়ে আসে। তবে বর্দ্ধমানের জমিদারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বিষ্ণুপুরের পক্ষে চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। এই শত্রুতায় সাময়িক প্রশমন ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মারাঠা আক্রমণের সময়ে। বিষ্ণুপুর দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দৃঢ়তা মারাঠাদের কাছে দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল। তবে মারাঠা আক্রমণ এবং ক্রমশঃ বাংলার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে দুর্বল হতে থাকে মল্লভূমের অর্থনীতি। ১৭৫২ সালে বাংলার এক যুগসন্ধির লগ্নে চৈতন্য সিংহ শাসনভার গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ১৬৯৪ সালে পোড়া ইঁটের তৈরি একরত্ন মন্দির হিসেবে দুর্জন সিংহ কর্তৃক নির্মিত হয় মদনমোহন মন্দির। ১৭২৬ সালে রাজা গোপাল সিংহ নির্মাণ করেন জোড় মন্দির। ১৭৩৭ সালে রাজা কৃষ্ণ সিংহের পত্নী চুড়ামণি দেবী নির্মাণ করেন রাধামাধব মন্দির। বিষ্ণুপুরের শেষ স্বাধীন শাসক চৈতন্য সিংহ ১৭৫৮ সালে নির্মাণ করেন রাধেশ্যাম মন্দির। তাঁর রাজত্বকালে চারটি পোড়া ইঁটের শিখর মন্দির নির্মিত হয়। এগুলি হল কৃষ্ণ, বলরাম, নিকুঞ্জ বিহারী এবং কেশব রায়। নন্দলাল মন্দির নামে ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি একরত্ন মন্দিরও নির্মিত হয়। বিষ্ণুপুরের একটি নবরত্ন মন্দির

যা শ্রীধর মন্দির নামে পরিচিত নির্মিত হয় মল্লরাজবংশের গৌরব অবসানের কালে।

ভারতবর্ষের মন্দির নির্মাণ শিল্পের যে ধারা সপ্তদশ–অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত তার থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল বিষ্ণুপুর। বাংলার শিল্পীরা উড়িষ্যার শিখর রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েও নিজস্ব ধারায় তৈরি করেছিলেন সোনাতপলের সূর্য মন্দির। বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে প্রাচীনকাল থেকেই উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উড়িষ্যার রেখ মন্দিরের প্রভাব পড়েছিল বাংলার শিখর মন্দিরে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব সৃজনশীল কল্পনাশক্তি মন্দির স্থাপত্যের রূপায়ণে বিষ্ণুপুরকে অনন্য করে তুলেছে। বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও শিল্পীর সৃজনশীল কল্পনা বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্পকে অনন্যতা দিয়েছে। মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে বিকশিত হয় পোড়ামাটির ভাস্কর্য শিল্প। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ মন্দিরই মাকরা পাথরে নির্মিত। অনেকগুলি মন্দির অলঙ্করণের জন্যে বিখ্যাত। বিষ্ণুপুর মন্দিরগুলিতে কৃষ্ণলীলা কাহিনীর প্রাধান্যই বেশি। তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বচিন্তা উদ্ভূত কৃষ্ণলীলার টেরাকোটা চিত্রের পাশাপাশি লোকায়ত কৃষ্ণলীলারও অনেক টেরাকোটা চিত্রে পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের সংমিশ্রণে নতুন ধরণের মোটিফ তৈরির প্রয়াসই এখানে বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। শ্যামরাই মন্দিরে রাসলীলার চল্লিশটি ভঙ্গিমা মন্দির অলঙ্করণে ব্যবহৃত হয়েছে। এক অপূর্ব ভাস্কর্য শৈলীর নিদর্শন হ'ল অনন্তশয়ানে বিষ্ণু। দশাবতার ও দশমহাবিদ্যার একত্রে উপস্থিতি ধর্মের ক্ষেত্রে নানা দিকের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিষ্ণুপুর টেরাকোটা মন্দিরগুলির মধ্যে নির্মাণরীতিতে অনন্যসাধারণ হল জোড়বাংলা যা স্থানীয়ভাবে কেষ্ট রায় নামেও পরিচিত। প্রধানত যুদ্ধের দৃশ্য সজ্জিত হয়েছে দক্ষিণ দিকের উপরিভাগের দেওয়ালে। পৌরাণিক কাহিনীর পাশাপাশি যুদ্ধের দৃশ্য বৈষ্ণব ধর্মের শান্তিপ্রিয়তার পাশাপাশি ক্ষত্রিয়ত্ব যে উপেক্ষিত থাকেনি প্যানেলগুলি তার সাক্ষ্য বহন করছে। মুসলিম স্থাপত্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল মন্দিরটি। এই মন্দিরগাত্রে পোড়া মাটির অসংখ্য মূর্তি বিভিন্ন কার্যকলাপে লিপ্ত। বস্তুতঃ সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে অভিজাত সম্প্রদায়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক ছবির অলংকরণ বাড়তে থাকে মন্দিরগাত্রে। শুধু পৌরাণিক ধাঁচার মধ্যে আটকে থাকেনি টেরাকোটা প্যানেল। তাই জোড়বাংলায় নৌকা লীলার ছবি পাওয়া যায়, পাশাপাশি পাওয়া যায় নৌকো বাওয়া, বিকিকিনির কাজে ব্যস্ত মেয়েদের ছবি। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরে নৃত্যরতা ও বাদ্যযন্ত্র হাতে মেয়েদের ছবি পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুর শ্যামরাই মন্দিরের টেরাকোটা প্যানেলে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন মহিলা এমন ছবি দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় রসশাস্ত্রের নির্দেশ পালিত

হলেও, ক্রমশঃ বিষয়গুলি বৈচিত্র্যেমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের নানা উপাদান—রামকথা, কৃষ্ণকথা, মহাভারত, গৌণ পুরাণের কাহিনীর পাশাপাশি ধরা পড়েছে সমকালীন বিষয়। অষ্টাদশ শতকের মন্দিরের টেরাকোটা প্যানেলে বন্দুকধারী বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে উত্তর ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে বিষ্ণুপুরের। ফলতঃ বাংলার বাইরের শিল্পধারার সঙ্গে পরিচিত হয় মল্লভূমি। শিল্পীরা লোকায়ত পর্যায় থেকেও যদি উদ্ভূত হয়ে থাকেন তবে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে তার সঙ্গে আপন কল্পনাশক্তি মিশিয়ে ভিন্ন ধারার স্থাপত্য নির্মাণে সক্ষম ছিলেন তাঁরা। মন্দিরগুলি শাসকের নান্দনিক বোধকে প্রকাশ করেছিল। একই সাথে মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে তুলেছিল রাজনৈতিক গুরুত্ব। যে সংঘাতের জায়গাগুলি রাজকীয় শক্তিকে নাড়া দিতে পারত সামাজিক স্তর বিন্যাসের সেই জায়গাগুলিকে বৈষ্ণবধর্মের অন্তরালে দমিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল। কৌম সর্দারের ক্ষত্রিয়ত্বে উত্তরণ নীচের স্তরে কৌম গোষ্ঠীগুলির বিদ্রোহ চেতনাকে কিন্তু দমন করতে পারেনি। তাই প্রয়োজন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে শাসকের ধর্মের ক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপন এবং মন্দির নির্মাণ স্থাপত্যের মধ্যে ক্ষমতার প্রদর্শন। বৈষ্ণবধর্মের বিনয় কখনই রাজ পরিবারকে বিদ্রোহ, চক্রান্ত ও নিষ্ঠুরতা থেকে দূরে রাখতে পারেনি। ক্ষমতাই ছিল ভরকেন্দ্র। সেই ভরকেন্দ্রকে অটুট রাখতে প্রয়োজন ছিল বৈষ্ণব উদারতায় মন্দির নির্মাণ। প্রজাদের জন্যে হরিনাম বাধ্যতামূলক করে তাদের রাজকীয় ক্ষমতার অধীনে নিয়ে আসা প্রতিরোধের পথগুলি বন্ধ করার প্রয়াস ছাড়া কিছু নয়। মন্দিরগুলি অর্থনৈতিক আয়ের উৎসও ছিল তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের পথে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের আগে পর্যন্ত বিষ্ণুপুর তার স্বাতন্ত্র্য একরকম বজায় রাখতে পেরেছিল। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতালাভ বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানটিকে পাল্টে দেয়। ভূমিরাজস্বের ক্রমবর্ধমান চাপে জমিদার ও রায়ত দুজনেই বিপর্যস্ত হয়। বকেয়া খাজনা মেটাতে না পেরে বন্দী হন চৈতন্য সিংহ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয় গ্রাস করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকেও। বিষ্ণুপুরের মন্দির শিল্প স্বাতন্ত্র্য হারায়। নতুন করে বাঁচার তাগিদে নতুন জীবিকার খোঁজে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন টেরাকোটা শিল্পীরা।

তথ্যসূত্র (বাংলা)

১. দীনেশ চন্দ্র সেন ঃ বৃহৎ বঙ্গ, খণ্ড দ্বিতীয় দে'জ পুনমুর্দ্রণ, ১৯৯৩
২. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬
৩. বিষ্ণুপুর তথ্যগ্রন্থ মার্চ, ২০০৮, বিষ্ণুপুর
৪. বাঁকুড়ার খেয়ালী, অক্টোবর, ২০০৮, বাঁকুড়া
৫. মাণিকলাল সিংহ ঃ পশ্চিমবঙ্গ তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি
৬. তরুণদেব ভট্টাচার্য ঃ পুরুলিয়া; কলকাতা, ১৯৮৬
৭. রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী ঃ বাঁকুড়া জনের ইতিহাস সংস্কৃতি
৮.হিতেশরঞ্জন সান্যাল ঃ বাংলার মন্দির, কারিগর–২০১২

তথ্যসূত্র (ইংরাজি)

1. Abhaya Pada Mallik - History of Bishnupur Raj - 2nd edition, Bishnupur, 1982
2. David Maccutchion - The Temples of Bankura District
3. L.S.S. O'Malley - Bengal District Gazetteers, Calcutta, Reprinted 1995
4. Prabhat Kumar Saha : Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur (1590-1806 A.D.), Calcutta, 1995.

GLOBAL WARMING AND ITS IMPACT ON THE GLACIERS IN THE HIMALAYA

Anupriya Chatterjee
Assistant Professor (Dept. of Geography)

Introduction

Presently all the nations of the world are particularly concerned about the trend of rapid global warming through drastic climate change mainly by anthropogenic processes leading to climatic disorder at local, regional and global levels. Hence the concern over global warming has come to the centre of all debates relating to the environmental degradation and management at both national and international levels. In 2001 IPCC confirmed that global average surface temperature has increased about 0.6°C over the 20th century and the temperatures, as projected under various models, are supposed to increase by 1.4°C to 5.8°C by the year 2100 relative to the temperature in 1900. According to another view the average air temperature in the northern hemisphere increased by 0.4°C between 1880 and 1940 because of rapid rate of combustion of fossil fuels (viz., coal, petroleum etc.), but temperature dropped after 1950 for some years IPCC in its latest report (December 2006) identified 2006 as the *'warmest year'*. In support of this statement the report stated that the global atmosphere observed an increase of 0.6°C in 2006 over the average temperature maintained during the period 1961-1990. According to the environmentalists the two most important human activities that led to gradual rise of CO_2 level in the atmosphere; are increasing rate of burning of fossil fuel and loss of CO_2 sink and gradual rise of destruction of forest cover.

Global Warming and Greenhouse Gases

Role of Greenhouse gases in Global Warming

Global Warming or the so-called 'Greenhouse effect' was first observed in 1986 independently by the Swedish chemist Arrhenius and the American geologist Thomas C. Chamberlain. The phenomenon has been termed as *Greenhouse effect* because it was originally thought that greenhouses (the vegetable growing glass houses in the cold countries) are heated in the similar manner. The sun rays passing through the glass of closed greenhouse include shorter wave length radiation which is absorbed by the objects inside, which in turn radiate the heat but at longer wave lengths (infrared radiation) to which the glass is nearly opaque. The heat is therefore trapped in the greenhouse with the net result that there is a sharp rise in temperature together with more condensation of water particles on the glass leading to some cooling; but without ventilation and in bright sunlight the greenhouse can reach intolerable temperature. It is now believed that due to increasing formation of coating in the upper atmosphere by pollutant the earth's atmosphere has taken the form of a 'global green house'.

The most important greenhouse gases – carbon dioxide, methane, water vapour

and nitrous oxide – all occur naturally in the atmosphere and without their greenhouse properties the earth's mean temperature would be about 33°C lower than at present (Houghton *et.al.*, 1990). However, the atmospheric concentrations of source of these gases have increased dramatically over the last 100 years or so due to modifications of natural cycles by human populations, while new gases with greenhouse properties, notably Chlorofluro-carbon or CFCs, have also been added particularly since the 19th century.

Recent findings on Global Warming

As mentioned earlier Arrhenius first described Global Warming but in 1988 James Hansen of NASA proposed a theory of GW depending on the fact that humans are causing a detrimental change in the earth's climate. Their theory took into consideration the data on temperture, greenhouse gas levels and climate phenomenon. The GW theory rests on the various aspects of climate models; scientific analyses of the past and present climate data and the trends as well as the assertions that increase in greenhouse gases concentration in the atmosphere are driving up global temperatures. Measurements of surface temperature at hundreds of locations for more than 100 years point to fact that the earth's temperature has increased by 0.6°C in the past century.

Global warming was particularly prominent during the last 20 years and has been accompanied by retreating Alpine glaciers, thinning Antarctic ice-sheet, rising sea levels, lengthening of growing seasons for the cold countries and earlier arrival of migratory birds. All these data support the feature of global warming. There is also debate over the global warming phenomenon because of disparities between surface temperature of the earth and upper air temperature. In spite of this debate the warming trend in the global mean surface temperature observations during the past 20 years is absolutely real and is substantially greater than the average rate of global warming of the 20th century. More preciously global warming is an example to substantiate environmental scares.

It has already been mentioned that some greenhouse gases occur naturally in the atmosphere while others arise out of human activities. Naturally occurring greenhouse gases are water vapour, carbon dioxide, methane, nitrous oxide and ozone. Carbon dioxide is release to the atmosphere when solid waste, fossil fuels (oil, coal and natural gas), wood and wood products are burnt. Methane emissions results from the decomposition of organic wastes in municipal and waste landfill. This gas is also emitted during the production and transportation of coal, natural gas and oil. Nitrous oxide is emitted during. agricultural activities as well as during combustion of solid wastes and fossil fuels. Greenhouse gases that are not naturally occurring include byproducts from production, refrigeration and air-conditioning and are called Chloroflurocarbons (CFCs). Perfluorocarbons (PFCs) as well as Hydroflurocarbons (HCFs) are generated by industrial processes.

Impact of global warming on glaciers and snowfields in the Himalaya mountain

Mountain regions are more sensitive to climate change than any other topographic regions. A study by the United Nations Environment Programme (UNEP) and the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) reveals that the temperature in the Himalayan region has risen by about 1°C since 1970s. This pattern of climatic amelioration causes meltdown of snowfields and retreat of glaciers' at the fastest rate (15 myear-I) in the world (Mehovic, J. and Blum, J., 2004).

Pattern of Retreat of glaciers in the Himalaya

Glaciers and snow fields are the most valuable treasures of the Himalaya for their both aesthetic and resource values that contribute immensely to its total environmental system. This mountain complex has as many as 1,500 glaciers, and along with their adjacent snow fields they occupy about 33,000km² areas. Recent studies have revealed that almost 67% of the Himalayan glaciers have retreated markedly in the past decades (Ageta and Kadota, 1992; Yamda et al., 1996, Fushimi 2000). The fim-line altitude of glaciers (the altitude at which both accumulation and ablation of snow and ice on the glacier remain at equilibrium) is steadily receding upward. And it is estimated that the firn-line altitude of tile glaciers in the Western Himalaya is resting at 50-80m higher than the altitude during the first half of the 19th century (Pender, 1995). The records show that the Gangotri Glacier in Garwal Himalaya is now retreating by about 30m year", confirming the view that the rate of ice melting (ablation) from this glacier body is now faster than accumulation.

Table 1: Pattern and rate of retreat of some important glaciers in the Western Himalaya

Name of glacier	*Pattern of Retreat*		*Total Retreat*	% of Reduction
	Year	*Rate*		
Gangotri Glacier	1842-1935 1935-1990 1990 onwards	7m/yr 18m/yr 30m/yr	0.64km 1.00km 0.5km	12%

Problems of dam burst and flash floods: There is every possibility that the rapidly melting glaciers would swell local lakes in the mountain, triggering flash flooding in the narrow valleys downstream. In 1994 a glacier lake outburst in the Lunana region of Bhutan and flooded a number of villages below, endangering the lives of thousands of people. The burst of the Dudh Koshi Lake in Nepal in 1997 made similar hazards (Mehovic and Bloom, 2005). The experts maintain that this trend will accelerate in the ensuing years, creating social and economic problems not only for the villages in the Himalayan foothills but also for the entire South Asian region.

Variation in the river discharge pattern : As reported in IPCC (1998) glacier melt is expected to increase even further under changed climatic conditions, which

would lead to increased flows in some rivers for the first two decades in this century followed by a reduction in flow as the glaciers disappear. As far as the seasonal discharge character is concerned it is presumed that the river flows will increase from January through March but decrease from April through September. The contribution of snow to the runoff of major rivers in the eastern Himalayas is about 100% (Sharma, 1993) but more than 60% in the western Himalayas (Vohra, 1981). Because the melting season of snow coincides with the summer monsoon season, any intensification of the monsoon is likely to contribute to flood disasters in Himalayan catchments. Such impacts will be observed more in the western Himalayas compared to the eastern Himalayas because of the higher contribution of snowmelt runoff in the west (Sharma, 1997).

At present the rivers rising from the Western Himalaya have shown 3-4% surplus water due to a 10% increase in the melting of the glaciers, and a 30% increase for those rising from the Eastern Himalayan glaciers. But, after 40 years, when most of these glaciers will cease to diminish South Asia will have water problems. In March 2002, UK's Department of International Development funded a project called *Sagarmatha* (Snow and Glacier Aspects of Water Resources Management in the Himalayas) to assess the impact of deglaciation on the seasonal and long-term water resources in snow-fed Himalayan rivers. Parts of the finding of their studies reveal some major facts about the melting mountain and warming glaciers. As per the report in Upper Indus, there will be initial increases of 14% and 90% in mean flows over the next few decades which will be followed by decreasing flows by 30% and 90% of baseline in the subsequent decades in a 100-year stretch of time. For Bhagirathi (the source stream of Ganga), at Uttarkashi, the flows peak will rise of the order of 20% to 33% above baseline within the first few decades and then recede to 50% of baseline after 50 years.

For Brahmaputra River, near its source there is a general decrease in decadal mean flows as glaciers are few in the area and flows recede as the permanent snow cover reduces with increasing temperature. The catchments in the eastern Himalaya, which benefit from heavier precipitation of the summer monsoon are more vulnerable to impacts of deglaciation than those in the west where the monsoon is much weaker.

References:

- Chattopadhyay, G.P. (2008): Glacial lake outbursts and related environmental hazards: some observations in the Sikkim Himalaya (in Press - Visva-Bharati Publication).
- Climate Change Report (2001): Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability, **IPCC, CH-II. ASIA.**
- Houghton; J.T., Jenkins, G.J. and Ephuraums, J.J. (1990): Climate Change: The IPCC *Scientific Assessment.* Cambridge University Press, Cambridge.
- Mehovic, J. and Blum, J., (2005): Global Warming and Melting Glaciers in South Asia: Environment, Economic and Political Implications. SARID Journal, Vol. 1, Issue-2

MOUSUMI ROY
Professor,
Dept. of Joology

BIDYUT DUTTA C M Y BK

SUPERWOMAN-CREATOR SHE IS

Megha Chakraborty
B.Com (Hons.) Semester II

A daughter to her parents, A sister to her siblings, A wife to her husband, A mother to her children, A boss at work, to a leader of a country. A single soul and mind playing different roles in the daily life. As the saying goes - "The hand that rocks the cradle, rules the world". The SUPERWOMAN of our daily lives. But at the end of the day, her super powers are always taken for granted. We have given her such a world, where her culinary skills are much above than the number of degrees he holds. The creator of another life She is, yet faces so much difficulties in life where her super powers do not work. She has some one who abuses her and she is unable to fight back. When the deadline to get back home is 7p.m. or 8p.m. When you try to fix a match for her just as she completes college. She does enough for others around her, but only if she could do justice to herself. The one blaming her, give her equal opportunities and see how high she soars. Before raising a hand on her think twice if you could survive after you bleed every month. Only a handful are there who try to give a proper place to this SUPERWOMAN. But it is easier said than done. Approaching feminism would be too mainstream. Fight for EQUALITY or probably call it EQUALISM. It is not fight against the opposite gender. But we want them beside us. Afterall both are the two different sides of the same coin. Imagine a world where people will be proud to bring a girl child home. It is a long way to go, but with joined efforts that day is not far enough to reach. Imagine, Make and Live is all we have to do.

পঞ্চাশের দশক : বিশ্বে এবং ভারতে নারীমুক্তির দশক

নন্দিনী রায়
অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)

চল্লিশের দশকের শেষে প্রকাশিত হল সিমোন দ্য বোভোয়ার "The Second Sex"। নারীকে পুরুষশাসিত সমাজে যে দৃষ্টিতে দেখে তা তিনি স্পষ্ট করে দিলেন--তিনি বলেছেন জন্মলগ্নে কেউ নারী থাকে না, সে থাকে মানুষ--সামাজিক বৈষম্যই তার নারী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে ছুঁড়ে দেওয়া এই প্রশ্ন থেকেই পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে নারীবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে উঠল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হতে লাগল।

পঞ্চাশের দশকেই বিশ্বনারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে ভারতীয় নারী আন্দোলন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনে যোগ দেন ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধিরা। ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গীতা মল্লিক।

১৯৫৩ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী মহাসম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন রেণু চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে নারীদের বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়--পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন তাঁরা! তাঁরা চেয়েছেন স্থায়ী কাজের নিরাপত্তা, কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার, মায়ের বিভিন্ন অধিকার, জমির মালিকানা, শিক্ষার অধিকার; নির্বাচিত হওয়া ও ভোট দেওয়ার অধিকার এবং গণতান্ত্রিক সংগঠনের কাজ করার অধিকার।

এই সম্মেলনের পর সর্বভারতীয় কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে কলকাতা জাতীয় মহিলা কংগ্রেস আয়োজিত হয়--নারীদের জীবিকা, কৃষক নারীর অধিকার, নারীদের রক্ষায় আইন প্রণয়ন, নারীর মাতৃত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'বিশেষ বিবাহ বিল' এবং 'বিবাহ বিচ্ছেদ বিল' সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়--সেইসঙ্গে প্রস্তাব আনা হয় পণপ্রথা বন্ধ করার বিষয়ে।

'ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন' গঠিত হলে তার সভাপতি হলেন পুষ্পময়ী বসু। মহিলা ফেডারেশানের সঙ্গে বিভিন্ন নারীসংগঠন যুক্ত হয় এবং ভারতীয় জাতীয় মহিলা ফেডারেশন বিশ্ব নারীসংঘের শাখারূপে এদেশে কাজ করতে থাকে।

১৯৫৬ সালে বিশ্ব নারীসংঘের উদ্যোগে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বিশ্বমাতৃ মহাসম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ঐ বছরেই চীনের নেত্রী সানইয়াৎসেন ভারতে আসেন। তিনি কলকাতার এক সংবর্ধনা সভায় বিশ্বে শান্তিরক্ষায় নারীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে সেখানকার নারীরা অংশগ্রহণ করেন এবং এই আন্দোলনের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রচার করেন রাজ্যে জুড়ে। বঙ্গ–বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তীব্র আন্দোলন করেন এবং তাঁদের অনেক সদস্য গ্রেফতার বরণ করেন।

১৯০৬ সালে চীনের পিকিং–এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারীসংঘের কাউন্সিল অধিবেশনে ভারতীয় নারী প্রতিনিধিরা যোগ দেন। ঐ বছরই ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী শ্রমিক সম্মেলনেও ভারতের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দেশের নারী শ্রমিকদের সমস্যা ও তার প্রতিকারের বিষয় এখানে আলোচিত হয়।

পঞ্চাশের দশকে লোকসভায় কিন্তু নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯৫২ সালে রাজ্যসভায় মহিলা সাংসদদের সংখ্যা ছিল ১৬ এবং ১৯৫৯ সালে গঠিত রাজ্যসভার মহিলা সাংসদদের সংখ্যা মাত্র ২ বেড়ে হয় ১৮। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ১৯৫২ সালে মাত্র ০.৮ শতাংশ প্রতিনিধি ছিলেন মহিলা। এই সংখ্যা সামান্য বেড়ে ১৯৫৭ সালে গঠিত বিধানসভায় হয় ৩.৬ শতাংশ।

তবুও চল্লিশের দশকের তুলনায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান অনেকটা উন্নত হয়েছিল সন্দেহ নেই। জীবিকার ক্ষেত্রেও নারীর সুযোগ–সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই দশকেই হিন্দু কোডবিল অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ানো হয়। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়, অসবর্ণ বিবাহকে হিন্দু বিবাহবিধিতে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়। মেয়েদের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয়।

এই আর্থ–সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালী নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী নারীর জীবনেও পরিবর্তন আসে, যা হয়তো অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রয়োজনের তাগিদে তাদের ঘর ছেড়ে বেরোতে হয়। উদ্বাস্তুজীবনের যন্ত্রণা, আর্থিক

নিরাপত্তার অভাব বাঙালী নারীকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে দেয়।

পাশাপাশি বাঙালী মধ্যবিত্ত নারী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রেও এগিয়ে আসে। এই দশকেই আমরা দেখি প্রথম মহিলা বৈমানিককে, ইংলিশ চ্যানেল পার হতে দেখি আরতি সাহাকে, মাদার টেরিজা কলকাতায় আসেন সমাজসেবার ব্রত নিয়ে।

এভাবেই পঞ্চাশের দশকের বাঙালী তথা ভারতীয় নারী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে বিরাট পৃথিবীটার খোঁজ পেল। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এক বিরাট বদল আনল নারীসমাজে। বিশ্ব নারী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিয়ে ভারতীয় নারী আন্দোলন ভবিষ্যৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দেখাল নারী সমাজকে।

বিবর্তনের আড়ালে : দেবী মনসা

নীলাঞ্জনা সেন
অধ্যাপক (ইংরেজি বিভাগ)

যে সময়ে পাঠ্য পাঠকের দ্বারা একাধারে পঠিত ও গঠিত হয় বলে স্বীকৃত সেই যুগে একথা প্রায় একটি cliche-তে পরিণত হয়েছে যে আমাদের মূর্তিকল্পনার মতো দেবসত্তা কল্পনা ও বিশ্লেষণ কল্পনাকারীর ব্যক্তিগত মনন, মনীষা ও মানসিকতা এবং সমষ্টিগত জীবনবোধ বা veltanschunng–এর প্রতিবিম্ব। আর দেবতা যখন সাহিত্যের উপাদান হয়ে ওঠেন, তখন তো স্রষ্টার মানসপট লাভ করে এক বৃহৎ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি যা স্রষ্টার অনবধানেই একটি যুগের দলিল হয়ে ওঠে। এই বাস্তবটি প্রায় ব্যত্যয়হীনভাবে প্রমাণিত হয়, যখন একই চরিত্রে, এমনকি, একই দেবচরিত্রে বিভিন্ন যুগে তথা একই সময়ে বিভিন্ন উপস্থাপনায় ভিন্নতর মাত্রা লাভ করে। তাই মঙ্গলকাব্যকার বিজয়গুপ্ত যখন পদ্মাপুরাণে দেবী পদ্মার বন্দনা করেন, তাঁর দেবীর প্রসাদলাভের সুস্পষ্ট আর্তিকে ছাপিয়ে প্রতিভাত হয় বহু conflicting ideology-র সহাবস্থান এবং গ্রন্থটি হয়ে ওঠে একটি বিশেষ সময়কার সামাজিক অবচেতনের তথা যুগ পরিবর্তনের নথি।

শ্রীযুক্ত হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, বাংলাদেশে মূলত মধ্যযুগীয় সেন রাজবংশের আমলে পরিপুষ্ট এবং মঙ্গলকাব্যগুলি দ্বারা সিঞ্চিত মনসা দেবী কল্পনায় অনার্য ও স্থানীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও তাঁর কোনো কোনো রূপ প্রাক–পৌরাণিক যুগেও বিদ্যমান ছিল। যদিও অর্বাচীন পুরাণসমূহ যথা ব্রহ্মবৈবর্ত ও দেবী ভাগবত ইত্যাদির পূর্বে মূল বৈদিক সাহিত্যে ও প্রাচীন পুরাণগুলিতে মনসার স্বতন্ত্র দেবসত্তা উল্লেখিত হয়নি, তথাপি মনসাকে শিবশক্তি দুর্গা, সাবিত্রী ও অন্যান্য দেবীর মতোই আদি সরস্বতীর প্রভাবে কল্পিতা বলে মনে হয়। আচার্য সুকুমার সেন সরস্বতী ও মনসার সাদৃশ্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন––

"সরস্বতী অবিবাহিত (মতান্তরে বিষ্ণুপত্নী), মনসাও স্বাধীন নারী (জরৎকারুর সহিত তাহার বিবাহ দেবসমাজে মুখরক্ষা মাত্র), সরস্বতীকে স্রষ্টা (ব্রহ্মা) কামনা করিয়াছিল, মনসাকে পিতা (শিব) কামনা করিয়াছিল। সরস্বতী বিদ্যাদেবী, মনসা প্রথমে বাক্, পরে বিষবিদ্যা মূর্তিমতী। সরস্বতী গীতবাদ্যের দেবী, মনসা গীতবাদ্যপ্রিয়।"

তিনি ও দেবী লক্ষ্মী উভয়েই কমলা ও পদ্মা নামে পরিচিত, ধনদাত্রী, পদ্মসংশ্রবা, উভয়েই জলজা। লক্ষণীয়, বিভিন্ন ধ্যানমন্ত্রে মনসার অনন্যসাধারণ আর্য সৌন্দর্য, ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানসম্পূর্ণতা বারংবার প্রাধান্য পেয়েছে— ''মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্''...!

তাছাড়া শিব, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও বিষ্ণুর মতো মনসার সর্পসংশ্রবকে কেবলমাত্র অনার্য টোটেম হিসাবে পরিগণিত করা সমীচীন নয়। তাঁর জগৎগৌরী নাম ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত শিশু গণেশ কোলে সিংহবাহিনী মূর্তিটি তাঁর সঙ্গে শিবানীর একাত্মতার সাম্যবাহক। তিনি গঙ্গার ন্যায় বিষহরণকারী তথা ব্যাধি উপশমকারী এবং ষষ্ঠীর ন্যায় সন্তানদাত্রী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে তিনি কাশ্যপ কন্যা, মানসজা, ঋগ্বেদ অনুযায়ী তিনি রুদ্রতেজমনা। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সুকুমার সেন লক্ষ্য করেছেন এই প্রাক্–পৌরাণিক দেবী পুরাণে স্থান পাননি এবং লোকসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে যখন রুদ্রমনা পর্যবসিত হয়েছেন চেঙ্গমুড়ি কানী–তে। এই Non-monolythic দেবীর রূপ ও সত্তা কল্পনার রূপান্তরের ইতিহাস feminity-র সংজ্ঞাগ্রাহ্যতা, অবস্থান ও তার প্রেক্ষিতে সমাজে বহুমাত্রিক বিবর্তনেরই ইঙ্গিত।

যে দেবীর মহিমাকীর্তন ও গৌরবপ্রচার পদ্মাপুরাণের কবির উদ্দেশ্য, সেই পদ্মা কবির কল্পনায় ও পাঠকের আকাঙ্ক্ষায় আশ্চর্য সম্ভাবনাময়ভাবে শ্রদ্ধাস্পদ হওয়ার তুলনায় অধিকতর ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছেন। স্বভাবতই, শ্রদ্ধা অপেক্ষা ভীতিই এই গ্রন্থের মূল চালিকাশক্তি, আর ঠিক এই কারণেই 'চাঁদ বণিকের পালা'–র রচয়িতার মতো যে কোনো স্বাধীন পাঠক, যিনি ঐ বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের বলয়ের বাইরে অবস্থান করেন, তিনি এই দেবী চরিত্রটিকে powerful negative energy–র প্রতিরূপ হিসেবে কল্পনা করবেন। কিন্তু এই আপাত যুগোত্তীর্ণ প্রতীকী বিশ্লেষণের আড়ালে একটি বিশেষ সময় ও সমাজের নারীকল্পনার একটি অদ্ভুত বৈপরীত্যময় ideology স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'মনসা–মিথ ও আধুনিকসঞ্চার' শীর্ষক বাংলা বিভাগের সেমিনারে আলোচিত বক্তব্যের অংশবিশেষ।

BIDYUT DUTTA C M Y BK

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ঃ
শক্তি আর ইচ্ছার মেলবন্ধন

সুদক্ষিণা ঘোষ
অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)

'বাঁশিওয়ালা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কলমে কথা বলেছিল এক সেকালিনী বাংলাদেশের মেয়ে, বাঁশিওয়ালাকে ডাক দিয়ে সে বলেছিল,

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ করে গড়তে–
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।

রবীন্দ্রনাথের কলমে অবশ্য 'শ্যামলী' কাব্যের এ কবিতার জন্ম হয়েছিল বিশ শতকের তিনের দশকে, কিন্তু এই কথাগুলোই হয়ে উঠতে পারত উনিশ–শতকে জন্ম নেওয়া যে–কোনো–মেয়ের মনের কথা, যদি এমন অনুপম ভাষায় নিজেদের বিবর্ণ জীবনছবি প্রকাশের ক্ষমতা সেদিন সত্যিই থাকত তাদের।

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পেরিয়ে আসতে আসতে আজ আমরা আর কতটুকু অনুমান করতে পারি কেমন ছিল ১৮৮০ সালের সেই বাংলাদেশ? কল্পনা করতে পারি কি উনিশ শতকের সেই শেষ শতক ছুঁটিতে রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে কেমন করে বড়ো হয়ে উঠছিল এক অভিজাত ভূস্বামীর কন্যা?

আমাদের গভীরতম কল্পনাও হয়তো আজ সম্পূর্ণ অনুমান করতে পারবে না অমন

সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে জন্মেও আশৈশব কী অসহায় পরাধীনতায় দিন কেটেছে রোকেয়ার, মানে–না–বোঝা সেই ছোট্টবেলা থেকেই কীভাবে পায়রাবন্দের সেই ছোট্ট মেয়েটি নিজের জীবনে অনুভব করেছে অবরোধবাসের যন্ত্রণা–অর্থহীন এই প্রথার সম্মানরক্ষার দায়ে কতদিন তাকে চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়ে দিন কাটাতে হয়েছে অনাহারে; বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে কতভাবেই না সে দেখেছে অবরোধবন্দিনী অসংখ্য মেয়ের বেদনামথিত জীবনছবি, বুকভরা মমতা নিয়ে চিনেছে সে সেইসব নিরুপায় মেয়েদের, শৈশব থেকেই যারা শিখেছে জীবনের চেয়েও মূল্যবান অবরোধের সম্মানরক্ষার দায়, তাই আগুন–লাগা–ঘরের বিবিরাও ঘর ছেড়ে বেরোয় নি যদি প্রাঙ্গণে পর্দা না থাকে––এই আশঙ্কায়, ঘন্টার পর ঘন্টা অভিযোগহীন বসে থেকেছে নিষ্প্রাণ আসবাবের মতো, দেশভ্রমণ করেছে ব্লুকবণ্ড চায়ের মতো ভ্যাকুয়াম টিনে প্যাক হয়ে, নিজেরই বাড়িতে বহিরাগত স্ত্রীলোকের চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে এমনভাবে ছুটে পালিয়েছে যেভাবে কেউ বাঘ–ভালুকের ভয়েও ছোটে না; এমনি করে সেদিনের মেয়েদের দিনযাপনের অন্ধকারের ছবি দেখতে দেখতেই একদিন সে–মেয়ে হাতে তুলে নিয়েছে তার প্রতিবাদের অস্ত্র––তার কলম; আর মর্মস্পর্শী ভাষায় সে–কলম শুনিয়েছে দুর্ভাগিনী অবরোধবাসিনীদের ঘিরে চোখের জলে আর ব্যঙ্গের তীব্রতায় মেশা কাহিনির পর কাহিনি, আমাদেরই ফেলে–আসা–প্রজন্মের মেয়েদের নিরুচ্চার বেদনার দিনলিপি––'অবরোধবাসিনী'।

কিন্তু কেমন করে হাতে কলম তুলে নিতে পারল সেই মেয়ে? তার অভিজাত পরিবারটিতে সেদিন তার জন্যেও তো সহজে খুলে যায় নি আলোর দরজা, সহজে মোছেনি অজ্ঞানতার, অশিক্ষার, অবরোধের অন্ধকার। সেদিনের বাংলাদেশের আরো অনেক পরিবারের মতোই তার পরিবারেও তো মেয়েদের পড়াশোনা ঘিরে ছিল এক অদ্ভুত আঁধার; পড়াশোনায় গভীর আগ্রহ দেখে তাড়াতাড়ি বিয়েই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল রোকেয়ার অগ্রজা করিমুন্নেসার, তবু রোকেয়ার বাংলা শেখার হাতেখড়ি হয়েছিল দিদির কাছেই, আর ইংরেজি ভাষার 'রত্নভাণ্ডারের দ্বার' বালিকা রোকেয়ার সামনে খুলে দিয়েছিলেন তার দাদা ইব্রাহিম সাবের, গভীর রাতে, বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়লেই শুরু হত এই দুই ভাই–বোনের পড়াশোনা, এমনি করেই রাতের গভীর অন্ধকারের পটভূমিকায় রোকেয়ার মন ভরে উঠত গভীর আলোর উদ্ভাসে।

রোকেয়ার আজীবনের স্বপ্নে–শ্রমে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠান সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের কথা আমরা আজ জানি নিশ্চয়, হয়তো কেউ কেউ জানি তাঁর গড়া

Suparna Das
B.A. 3rd yr. (Eng. Hons)

নারীহিতব্রতী আরেকটি প্রতিষ্ঠান–আঞ্জুমান–এ–খাওয়াতিনে–ইসলাম–এর নামও, তাঁর 'মতিচুর' বা 'অবরোধবাসিনী'র মতো কোনো কোনো বইও নিশ্চয় পড়েছি অনেকেই। কিন্তু শুধু এইটুকু পরিচয়েই কি রোকেয়াকে আজ চিনে নিতে পারব আমরা, বুঝে নিতে পারব কি মাত্র বাহান্ন বছরের জীবনপরিসরে ব্যথা আর বুদ্ধি, শক্তি আর ইচ্ছার সম্মিলনে গড়া তাঁর সব স্বপ্নের চরিতার্থতাগুলি, শুনে নিতে পারব কি তাঁর কলমের বেদনার্ত উচ্চারণ––"ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে জীব ভারত–নারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই।...পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্র তত্র 'পশুক্লেশ–নিবারণী–সমিতি' দেখতে পাই।... কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধ–বন্দিনী নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও ভূ–ভারতে নাই।"

যাদের জন্য কাঁদবার একটি লোকও নেই, ছোট্টবেলা থেকে সেই অসহায় অবরোধ বন্দিনী মেয়েদের দেখতে দেখতে করুণায়–মমতায়–কান্নায় বুক ভরে উঠেছিল রোকেয়ার, কিন্তু উপায়হীনের নিষ্ফল চোখের জল ছিল না তাঁর সেই সমানুভবে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বারণ–না–মানা এক বিদ্রোহিণীর দ্রোহের আগুন; সমাজে–সংসারে মেয়েদের কেবলই অনধিকারের দিনলিপিকে ঘিরে কখনো আপাত কৌতুকে, কখনো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে, কখনো প্রত্যক্ষ আঘাতে মুখর হয়ে উঠেছিল তাঁর কলম, কলমের নির্মম কশাঘাত সচেতন করতে চেয়েছিল আত্মবিস্মৃত এই সমাজকে।

জীবনভর লেখালেখির ফসল খুব বেশি নয় রোকেয়ার, তবু কখনো ধর্মের অবিচারে, কখনো শিক্ষায় অনধিকারে, কখনো–বা দিনযাপনের পরিসরের সঙ্কীর্ণতায়, নারীর বেদনাময় সমস্ত মুহূর্তগুলি জুড়েই ছড়িয়ে আছে সাহিত্যিক রোকেয়ার কলমের ছায়া। মনে পড়ে, বিশ শতক যখন প্রথম দশকে পা রেখেছে মাত্র, তখনই লিখতে পেরেছিলেন রোকেয়া, "...এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষ–রচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে–কথা শুনিতে পান, কোন স্ত্রী–মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন।" অন্ধ অচেতন এক সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে ঋজু কণ্ঠে সেদিন জানতে চেয়েছিলেন রোকেয়া, "ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ার ঈশ্বর? কারণ "যদি ঈশ্বর কোনো দূত রমণী শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূতবোধহয় কেবল এশিয়ায় নিবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণীজাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন?" সময়ের হিসেব নিলে আশ্চর্যই হতে হয় আজ, রোকেয়ার প্রবল ক্ষোভের

এই উচ্চারণ প্রকাশ পেয়েছিল 'নবনূর' পত্রিকায়, ১৩১১ বঙ্গাব্দে ভাদ্র সংখ্যায়।

ধর্মের গভীরতম সত্য অথবা প্রকৃত ধর্মগুরুদের ঘিরে শ্রদ্ধার অভাব ছিল না রোকেয়ার, কিন্তু বুঝতে পারি কেন কোনোদিন তাঁর ক্ষমা পায় নি ধার্মিক নামধারী ধর্মব্যবসায়ী 'কাঠমোল্লা'দের দল–শাস্ত্র যাদের কাছে অস্ত্রের অন্য নাম, ধর্মপালনের নামে মেয়েদের জন্য যারা নির্দেশ করে অন্ধকারার তমসারেখা, শিক্ষাহীন আলোহীনতায় বেঁধে রাখতে চায় তাদের––সেইসব 'ছদ্মবেশী শয়তান'দের বিরুদ্ধে কেন রোকেয়ার এই শাণিত উচ্চারণ। রোকেয়া যে বিশ্বাস করেন––"যাহার চক্ষু আছে, সে দেখুক; যাহার কর্ণ আছে, সে শুনুক; আর যাহার মন আছে, সে চিন্তা করুক।"

যার চক্ষু–কর্ণ–মন–এসবই আছে, অশিক্ষার অন্ধকারে দিনের পর দিন নিমজ্জিত রেখে তাকে অন্ধ–পঙ্গু–অচল করে দেওয়াতেই সমাজের সার্থকতা––এই সরল বাস্তবকে কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি রোকেয়া নামের ঐ অগ্নিসম্ভবা মেয়েটি। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের সূচনামুহূর্তে মেয়েদের জন্য স্কুল গড়ে তাদের শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দিতে প্রত্যক্ষ একটা লড়াই তো করেইছিলেন তিনি, সেই লড়াইকেই সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন তাঁর কলমের ভাষাতেও। শিক্ষিত মেয়েরা গৃহকর্মে উদাসীন হয়ে বিপর্যয় আনবে সমাজজীবনে––এই সমস্ত প্রচারে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার লাভের প্রয়োজনীয়তা ঘিরে যখন সন্দেহ আর আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়েছিল সমাজ জুড়ে, তখন নারীশিক্ষার পক্ষে একটি সহজ কথা অসাধারণ উপমায় শুনিয়েছিলেন রোকেয়া, লিখেছিলেন––"শিক্ষা স্ত্রীলোক–পুরুষ নির্বিশেষে সর্বদা বাঞ্ছনীয়। স্থলবিশেষে অগ্নি গৃহদাহ করে বলিয়া কি কোন গৃহস্থ অগ্নি বর্জন করিতে পারে?"

এমন প্রত্যক্ষ কশাঘাত কম দেখি না রোকেয়ার প্রবন্ধগুলিতে আর ক্ষোভের এই জ্বালাময় উদ্গীরণগুলিই রোকেয়ার লেখালেখি হিসেবে আজও বেশি পরিচিত বাংলার পাঠকসমাজে, হয়তো কিছুটা পরিচিতি আছে তাঁর 'সুলতানার স্বপ্ন' আর 'অবরোধবাসিনী'র, কিন্তু তুলনায় আজকের পাঠকের অনেক কম চেনা তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ'।

আজও মনে হয়, 'terrible এক revenge'ই নিয়েছিলেন রোকেয়া তাঁর স্বপ্নসম্ভব আখ্যান 'সুলতানার স্বপ্ন'–এ––ব্যঙ্গাত্মক কল্পমায়ায় ঘিরে যখন পরিবেশন করেছিলেন নারীপুরুষের প্রচলিত সামাজিক বিন্যাস বদলে দেওয়ার স্বপ্ন, স্বপ্নের নারীস্থানে গড়ে নিয়েছিলেন তাঁর আজীবনের সাধ এক নারী–বিশ্ববিদ্যালয়, বাহুবলের দাপটে অহংকৃত

পুরুষের দলকে মস্তিষ্কবলে হারিয়ে দিয়েছিলেন নারী–বিশ্ববিদ্যালয়ে–শিক্ষিত নারীদের কাছে, বন্দী পুরুষদের জন্য গড়ে দিয়েছিলেন 'মর্দানা'র অবরোধ; অনেকদিনের অনেক–চোখের–জলে–আঁকা জেনানার বিপরীতে 'মর্দানা' গড়ে তুলে অনুচ্চারিত বিদ্রোহে অননুকরণীয় ভঙ্গিমায় অব্যর্থ যুক্তি সাজিয়ে তখন যেন সমাজে পুরুষ–প্রাধান্যের অনিবার্যতাকে এক চ্যালেঞ্জই জানিয়েছিলেন রোকেয়া।

জীবনের সমস্ত হারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মেয়েদের জিতিয়ে দেওয়ার এই স্বপ্নই বুঝি রোকেয়ার জীবনভর সমস্ত লেখালেখির মর্মবাণী। 'পদ্মরাগ' নামে তাঁর একমাত্র উপন্যাসটিতেও দেখি, এক মুহূর্তের জন্যও রোকেয়ার মন থেকে মুছে যায় নি বাংলাদেশ জোড়া অভাগিনী মেয়েদের নিরুপায় ব্যথাকাতর মুখগুলি, কখনো ভুলতে পারেন নি এই নিষ্ঠুর সত্য যে, রাফিয়া–সাকিনা–সৌদামিনী বা হেলেন––যাইহোক সে মেয়ের নাম, আর হিন্দু–মুসলমান বা খ্রিস্টান–যাই–ই হোক তার ধর্মের নাম, আহত–অত্যাচারিত–উৎপীড়িত মেয়ের লাঞ্ছনার ইতিহাসে নেই কোনো জাতিভেদ বর্ণভেদ কিংবা সম্প্রদায়ভেদ, কোনো প্রভেদ নেই তার–ওপর–নেমে আসা পুরুষপ্রবল এই নির্মম সমাজের বঞ্চনায়–পীড়নে–যন্ত্রণায়, সমাজ বা পুরুষের গড়া অবমাননার মানদণ্ডে কোনো পরিবর্তন নেই তার অনিবার্যীয় ভবিতব্যের।

নিষ্ঠুর এই সত্যকে রক্তাক্ত রেখায় তুলে ধরতে ভোলে নি রোকেয়ার কলম, কিন্তু সেই সত্যকেই হয়ে উঠতে দেয় নি শেষ সত্য। রোকেয়ার কলম যে সত্য রচনা করেছে, সেই সত্যের সামনে সব হারিয়েও বিজয়িনী হয়েছে এই লাঞ্ছিত ভাগ্যতাড়িত মেয়ের দল––প্রতিবাদে, প্রতিরোধে, প্রত্যাখ্যানে জীবনের সমস্ত মারের বিরুদ্ধে তাদের জিতিয়ে দিয়েছেন রোকেয়া; মেয়েদের অসহায়তার ললাটলিখন বদলে দিয়ে আশ্চর্য এক তারিণীভবনের ছবি এঁকেছেন তাঁর একমাত্র উপন্যাসে, সে এমন এক বালিকা বিদ্যালয়, যেখানে ঠাঁই পেয়েছে সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের লাঞ্ছিত মেয়ে, যারা হারিয়েছে স্বজন–সংসারভরা ঘরের মায়া, কিন্তু হারায় নি জীবনকে অর্থবান করার স্বপ্ন, সমাজসেবার কাজে, বিদ্যাবিস্তারের ব্রতে, আর স্বাধিকারের শক্তিতে এই নিষ্করুণ সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে যারা বলতে পারে––"তোমাদের 'ঘর–করা' ছাড়া আমাদের আরও পথ আছে।"

রোকেয়া তাঁর শক্তি আর ইচ্ছে দিয়ে গড়েছিলেন এই মেয়েদের, এদেশের সমস্ত অবমানিতা মেয়ের কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিলেন তাদের মতোই আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণ; তাঁর উপন্যাসের নায়িকা সিদ্দিকা তাই ভালোবাসার উপরে স্থান দিয়েছিল তার আত্মসম্ভ্রমকে,

সংসারের সমস্ত সৌভাগ্য আর ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিয়ে অবিচল আত্মমর্যাদায় বেছে নিয়েছিল স্বাবলম্বনের পথ, পুরুষশাসিত সমাজের দ্বৈতমানের বিপরীতে দাঁড়িয়ে গড়ে নিয়েছিল নিজের নতুন সামাজিক পরিচয়, উন্নত মস্তকে বলতে পেরেছিল--"আমরা কি মাটির পুতুল যে পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন?" নিজেই নিজের জীবনের সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নিয়ে বলেছিল--"আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকট ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা-ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন-- 'আরে রাখো তোমার পণ ও তেজ--ঐ দেখ না, এতখানি বিড়ম্বনার পরে সিদ্দিকা আবার স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।'...আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে, সংসারধর্মই জীবনের সারধর্ম নহে।" ভাবতে অবাক লাগে আজ, এ উপন্যাস রোকেয়া লিখেছিলেন ১৯০২ সালে, রচনার বাইশ বছর পরে ১৯২৪ সালে প্রকাশ পেয়েছিল 'পদ্মরাগ', তবু এ-রচনার সমকালে বাংলার আর কোনো উপন্যাসে বোধহয় এমনভাবে জয়ী হয় নি ঐতিহ্যিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীর এমন বিদ্রোহ।

মৃত্যুর আগের রাতেও যে প্রবন্ধটি লিখতে লিখতে থেমেছিল রোকেয়ার কলম, অসমাপ্ত সে-প্রবন্ধটির নাম ছিল 'নারীর অধিকার' আর সে প্রবন্ধেও রোকেয়া খুঁজছিলেন বিবাহবিচ্ছেদে নারীর সম্মত বা অসম্মত হওয়ার অধিকার। দু'বেলা মরার আগে না মরবার কঠিন সংকল্পে, অবিচল আত্মবিশ্বাসে আর অটল আত্মমর্যাদায় হাজারো হার ছাপিয়ে যিনি দেখতে চেয়েছিলেন মানহারা সমস্ত মেয়ের জয়ের ছবি, সেই মনস্বিনী লেখিকার জীবনভর বিদ্রোহী দ্বৈরথ যে থামে নি তাঁর জীবনের শেষ রাতেও, তারই অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়ে গেল তাঁর কলমের এই শেষ আঁচড়টিতেও।

Women Empowerment and Advertisement:
A Marketing Strategy

SWEETY SADHUKHAN
ASSISTANT PROFESSOR, DEPT. OF COMMERCE

Advertisement is one of the important promotional tools in marketing. In recent times, the strategy adopted by the marketer is not only to promote a product or services but also to promote 'the honour and respect of the women' in our society. Previously, advertising depicted a traditional pictures of women who are simply a homemaker but in recent times the theme and concept of advertising changes. Quite a few brands have been quick to plug in a **'women empowering theme'** into their brand communication. In 2014, quite a few leading Bollywood actor and actress leveraged the 'respect for women' theme on social media and gain massive support from their followers.

- **Tata Tea 'Jaago Re' Campaign-** On the issues related to women empowerment superstar Shahrukh Khan express his commitment with a small beginning and Tata Tea awaken India once again in the Women's Day to put 'women first' with its new 'Jaago Re' social campaign.
- **Vivel by ITC 'AbSamjhauta Nahi'-** 'AbSamjhautaNahi' is cleverly placed that helps retain vivel's association with softness, while also playing to the popular trend of Women Empowerment.
- **Scooty peps 'why should boys have all the fun?'-** This campaign of 2007 succeeded in communicating the female empowerment tangent through zesty subliminal messaging to the society.
- **Dove 'Real Beauty' Campaign-** Dove launched its 'Real Beauty' campaign featuring everyday women that bring a radical new marketing movement steeped in female empowerment.
- **Titan Raga 'Women of Today"-** It celebrate the women who is modern, progressive, confident and passionate.
- **Titan Raga 'her life her choice"-** This ad again put emphasis on independence of women thoughts.
- **Nirma Ambulance-** This ad switched from portraying women as home-makers to women as change- maker.
- **Havell's Coffee Maker 'She is not a Kitchen Appliance'**
- **Stayfree 'Army'-** It primarily focus on the empowerment of women.
- **Stayfree's 'women for change' campaign-** The campaign offer basic hygiene education and services to rural Indian women folk is another classic illustration in point.
- **Vatika Hair Oil-** This hair oil captured the transition of the Indian women from traditional homemaker to a proud, professional go- getter.

- **Pro-Ease Go Long 'SirtEkShart K Koi ShartNahi'-** The ad featured by actress Priyanka Chopra which cleverly placed women as central focus and hence put emphasis on Women Empowerment.
- **Airtel Boss-** The smartphone network, Airtel launched a much in social media debate film called Boss features a female boss who is efficient enough to handle office as well as home.
- **Vogue Empower 'Start with the Boys'-** The short film featured by actress Madhuri Dixit throw light on the sufferings of woman being physically assaulted with a note that 'we have taught our boys from childhood not to cry. It's time we teach them not to make girls cry'
- **Mahindra Rise 'LadkiHaath Se NikalJaayegi'** with Project Nanhi Kali.
- **Nihar Naturals 'Akai Aiksho Woman'** with the slogan 'amranari, amrapari'.
- **Ariel Matic campaign 'Is laundry only a woman's job?**
- **Brooke Bond Red Level -** shatter the stereotype concept- pink is for girl, blue is for boys.
- **Tanishq** celebrates the concept of the remarriage of a mother.
- **PC Chandra Jewellers** in Kolkata takes a provocation stance on women's day, stating 'let's uncelebrate women's day and celebrate women everyday instead.
- **Joy cosmetics-** focus on inner beauty of a woman and not with body size or type.

Evolution in the Positioning A Beauty Product

From an aid to attract male attention

↓

To becoming a tool for asserting one's identity

Today, the theme of advertising drastically changes to promote the women society. But, no media can be successful in attaining women empowerment unless the women understand their inherent capability and with their never ending spirit break all the chain of slavery to prove their identity.

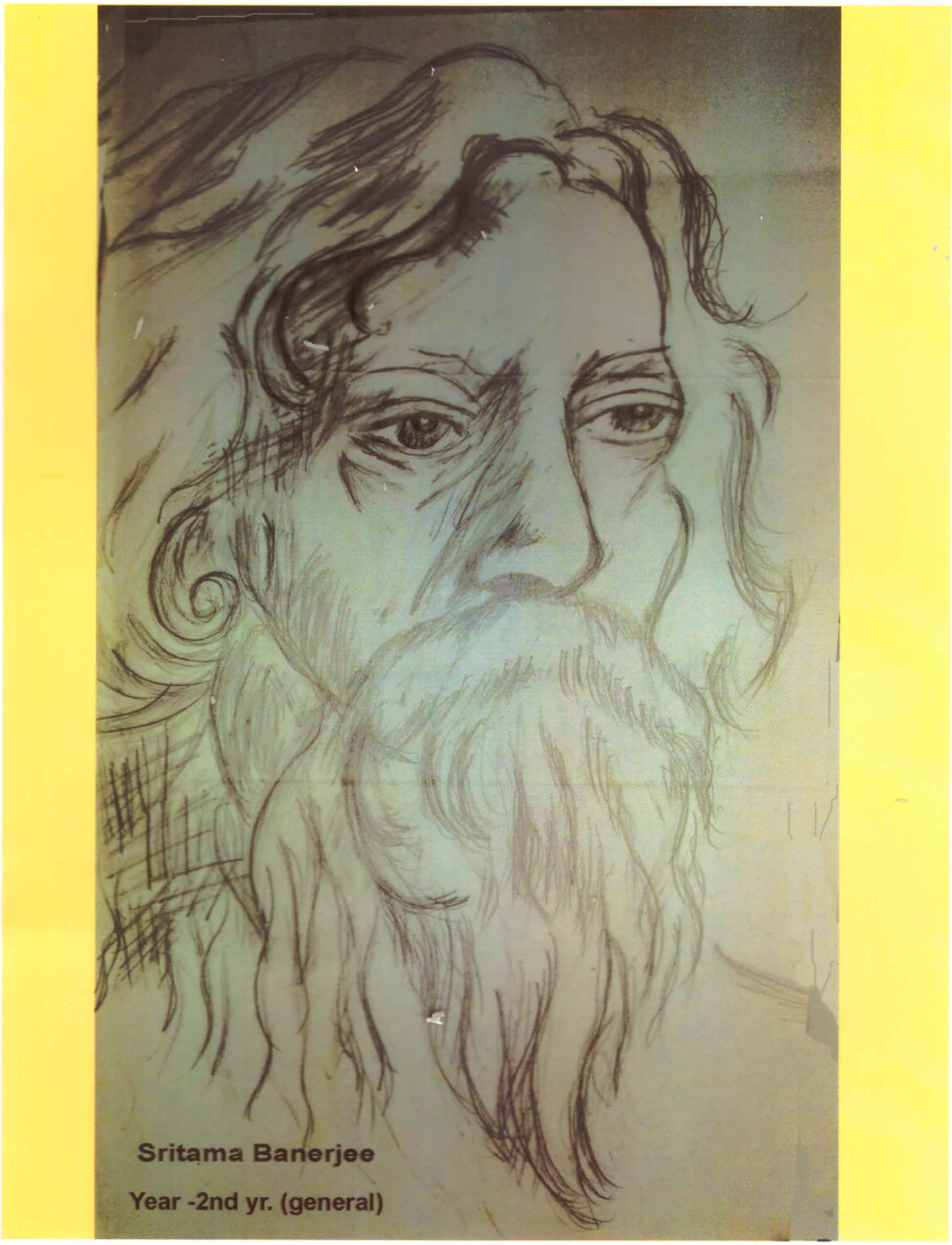

Sritama Banerjee

Year -2nd yr. (general)

পরিবর্তন

রুমনা সরকার
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

পরিবর্তন প্রকৃতিতে--
শরৎ শেষে হিমেল হাওয়া,
দুপুরে নরম রোদ্দুরের ওম,
দুপুর গড়িয়ে অলস বিকেল,
সূর্যাস্তের সময়-সারণী পরিবর্তিত...

কিন্তু পরিবর্তন যখন মানুষের?
যখন চেনা মুখ বদলে যায়?
বা বদলে গিয়েও চলে না বদলের অভিনয়?
এক অন্তর্দাহে বিদ্ধ
হৃদয় পুড়ে যায় ...
অনন্ত বিশ্বে একা হতে থাকা--

মূল্যবোধ আর মনুষ্যত্ব
সমাহিত আজ।
খোঁজ চলে সেই ফিনিক্সের,
আর আহ্বান নবজন্মের।

আহত মেঘবালিকা

সিদ্ধার্থ নন্দন
বি.কম. (অনার্স)

সেই যে ঝড়ো হাওয়ায় হারিয়ে গিয়েছিল
কবেকার কথা--
আজ সেই মুখপট--সটান--
আমার মুখোমুখি,
চেনা চোখের চকমকিতে ধন্ধ মুছে যায়।
কত দীর্ঘ পথের কুয়াশা পেরিয়ে এসেছে, জানি
তবু সেই চোখের গভীরে কী এক সন্ধানী আলো
চমৎকার স্বয়ম্প্রভ আজো--
সেদিনের রক্তাক্ত শরীর--
সটান দেবদারু হয়ে ফিরে এসেছে।
আহত মেঘবালিকা আজ আর মেঘ খোঁজে না--
হারানো কলমের কালি খুঁজে
হতাশ কান্নায় ভেঙে পড়া দিনগুলি
আজ অতীত মাত্রে
নতুন কবিতার খাতা এখন নিমগ্ন করেছে তাকে
চোখে তার নতুন ডানার উড়ান--
সেদিনের চেনা বৃক্ষটিতে আজ আর তরুলতার মতো
ওতপ্রোত নয় সে
আনকোরা নবীন পাতায়
একা, তবু নিঃসঙ্গ নয়--
ভয় আর বিষাদের গন্ধ মুছে ফেলে
আমার সেই মেঘবালিকা
পথ চলছে অমলিন--
আর পরতে পরতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে
এক আশ্চর্য সুন্দরের সঙ্গে--

বৃক্ষ

অঞ্জনা সামন্ত
বি.এ. জেনারেল, দ্বিতীয় বর্ষ

দাঁড়িয়ে আছি আকাশ গায়ে মেখে
বৃষ্টি-আলো-বাতাস মেঘের সাথে
চেনা মাটির গভীর ছুঁয়ে জল--
সেই জলের কাছে মুখ রেখেছে
আমার শিকড়তল।
পাতাল থেকে রূপকথা পায় ছাড়া
ডানা মেলে আমার শরীর জুড়ে
তখন, জেনো, কুলায় ফেরে পাখি
আকাশ এসে বসে আমার ঘরে

ঘরবসতি মাটির কাছে বাঁধা
তার উপরে জ্বালছি আকাশবাতি
শিরায় আমার লক্ষ যুগের কথা
যুগান্তরের নক্‌শা মেলাই সাথে
অসূয়াহীন রঙবাহারি ফুলে

আমার শুধু আলো হাওয়ার দাবি
তোমার সাথে ঘরকন্না খেলা,
আমার প্রাণভোমরা তোমার কুঠুরিতে
তোমার জন্য আমার দেরাজ খোলা।

মা

শ্রীতমা দাস
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

শব্দের গরিমা তুমি--আদি ধরিত্রীর মতো জেগে আছো--'মা'
তুমি এক বর্ণমালা, শাশ্বত, দীপ্র উচ্চারণ

গর্ভের অন্ধকার থেকে, লক্ষকোটি বছরের জন্মস্মৃতি ছুঁয়ে--
সূর্যসঙ্কাশ ভোরে ভূমিষ্ঠ--
তোমাকেই ছুঁয়ে দেখি
তোমার লাবণ্যের কাছে আমৃত্যু
নতজানু মাধুকরী করি
আলো-অন্ন-অমৃত যত
করপুটে ভরে--

অথচ, তোমার জন্য এই বন্দীশিবির,
ক্ষয় হওয়া আলো--
তার, ভিক্ষাপাত্রে সার
তোমারই চেনা ঘরে আজ
নির্বাসন তোমার--।

আমার মুক্তি

শ্রেয়সী সরকার
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

অজস্র প্রশ্নে বিদ্ধ করেছ আমাকে--
তোমাদের শাসন আমাকে কত চৌকাঠ পেরোতে দেয়নি
কখনো--
আমার ঘুম আর জাগা, সংসারের ইতিকর্তব্য সব,
বেঁধে দিয়েছ তোমরা, এমন কি মা, তুমিও--
কতদিন তুমিও আমার হাত থেকে
কলম কেড়ে নিয়েছ--
তুমি জানতে, ঐটুকু আমার স্বাধীনতা--

কনে দেখা আলোর দিকে মুখ করে বসিয়েছ আমায়
বলেছ, ব্রীড়া আমার ভূষণ
মাতৃত্ব আমার পরিচয়--

তোমাদের এই চেনা পরিসর ডিঙিয়ে
আমি তবু হেঁটে যাই
অনন্ত আরেক পরিক্রমা খুঁজে।

আরো একবার

মুনাওয়ারা খাতুন
বাংলা অনার্স, প্রথম বর্ষ

ওই যে মানুষগুলো অপেক্ষায় আছে
আমাদের থেকে পিছিয়ে পড়া
যে মানুষেরা অসহায়তায়
দিন গুনছে শুভদিনের--
এসো,
আমাদের অজস্র ভালোর থেকে
কিছু কিছু ভালোবাসা দিই
ওরা জানুক ওরাও মানুষ
মানুষের পাশে মানুষ এসে দাঁড়ালেই তা মানায়--
এই পরম সত্যটুকু প্রকৃতির পাঠশালা থেকে
এসে আরও একবার শিখে নিই আমরা
নামেই কেন হব মানুষ?
বিবেককে দূরে ঠেলে দিয়ে,
বেসুর গানই বা গাইব কেন?
অলস গানের সুরে--
দুঃখ সবার ঘুচিয়ে দেব,
জ্ঞানের আলো দিয়ে।

শপথ

দেবাঞ্জন বারিক
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

জগৎটাকে গড়বো আমি
মনের মতো করে,
গাছ-পালাদের সবুজ রঙে
রাখবো জগৎ ভরে।
হানাহানি থাকবে নাকো,
শান্তি শুধু রবে,
ধনী গরীব বিভেদ ভুলে
থাকবো মোরা সবে।
অনাদরে মরবে না কেউ
পেট ভরে সব খাবে,
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবো
শিক্ষা সবাই পাবে।
সেবা করার ব্রত নেবো
অসুস্থদের সনে,
পশু-পাখি মনের সুখে
থাকবে বনে বনে।
শপথটাকে রাখবো সদা
বুকের মাঝে ধরি
সবাই থেকো আমার পাশে
এই মিনতি করি।

COUNTING

Anindita Mitra, *Lecturer*
Department of English

12345
Picking up the Pieces
Hiding the creases
Tip-toeing the city in tagless cliches
I remember your name
Countless times
One, two, three, four, five ...
For I never did fake nor I do now
Fishing for the bait, hanging from the bough
O but still was easy to count on
The wishes I staked a backgammon
I repeat the digits, backwards now
54321
And I'm done!

SHADOWS

Anindita Mitra, *Lecturer*
Department of English

Silent departures
Ring not so loud,
The noisy corridors
Overcrowd.
The black walls
Self-erase
The alphabets'
Murky maze ...
Well, I re-delete the deleted
Un-stitch the demarcated
And mess it all deranged
Still, shadows creep in nights on end.

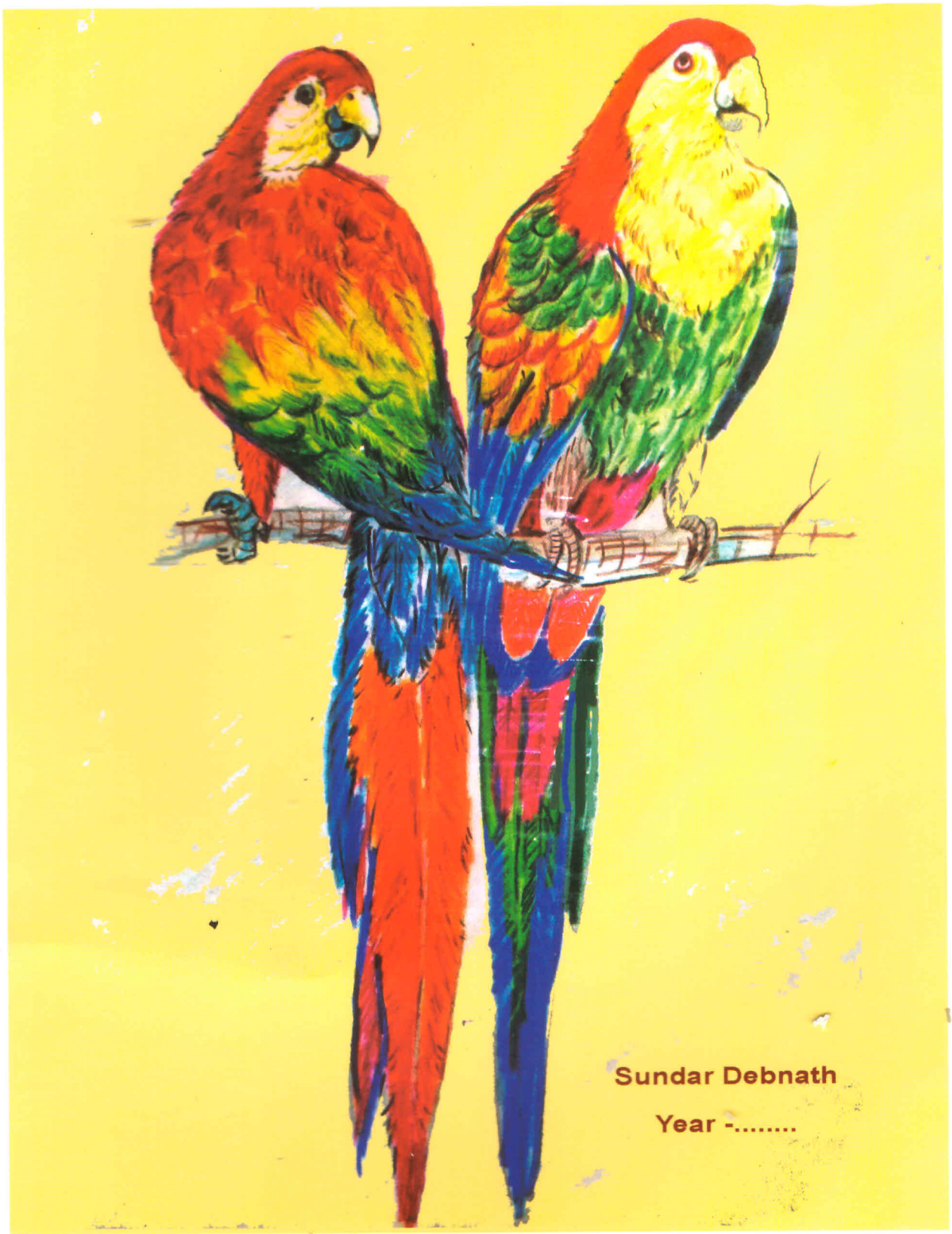
Sundar Debnath
Year -.....

The Frozen Beauty

Sunanda Pal
2nd Yr. General

Snow is falling far and white,
On the mountain tonight,
Penguins play.
All through the day.

Cold, windly breeze,
Makes everthing freeze,
White snow dust.
Blaws quite fast.

Penguins play,
Seals lay.
In the frozen month
Throughout the day

LIFE

Sayan Karali
BA General, 1st Year

You know what I meant to you
of love & friendship are in few,
The time which passes by,
Oh life ! what a mischief silence of thy.

Nothing can be true more than you
Show the expansion of your view,
Neither you live nor can I,
Cloudy mind failing to fly.

Spoil the toil that you bear,
Heaven or hell I do fear
How long would you cry ?
How far would you try ?
Death is immortal don't you lie?

খুকিটি আমার

প্রিয়াঙ্কা দাস
ভূগোল অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

অতসী অতসী--ভারি আল্‌তুসি
খুকিটি আমার
এই হাসি খুশি--এই জলে ভরা
নয়ন সরসী
এই রোদ্দুর, এই মেঘে ভরা--অভিমানিনী
খুশিখানি যেন শরৎ আকাশ
মুক্তাবরষী
অতসী আমার--হেসে ভাসিয়েছ--ভাঙা ঘর দেখি
আলো ঝলমল
মায়ের ছেঁড়া স্বপ্নের গায়ে--জ্যোৎস্নার ছিটে
হিরে টলমল
বাবার দুচোখে তুই রবিশশী--অতসী অতসী
একফালি মুখে স্বর্গপৃথিবী থৈ থৈ নাচে
--পরমাপ্রকৃতি লীলাময়ী দেখি--
তোর মুখেতেই
চিরবিশ্রাম।

নীরবতা

শিপ্রা ঘোষ
অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)

এই রাতে এমন মুকুট পরেছ, নৈঃশব্দ্য
এমন ক'রে এসে দাঁড়িয়েছ আমার দরজায়–
চেনা মুখে তিলধারণের জায়গা নেই
শতশত ঢাক বেজে ওঠে মদে ঘোর হয়ে
শব্দগুলি রাত্রির মুখ থেকে প্রলাপের মতো
গল্‌গল্‌ করে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে

এখন তুমি স্পর্শ ক'রে আছ জ্যোতিষ্কমণ্ডল
আকাশ এবং বায়ুতে পরিচ্ছিন্ন তুমি
তোমাকে ছুঁয়ে ফেললে
কপট শব্দের মায়া পুড়ে খাক হয়ে যায়
তুমি আদিত্য
আকাশ–অগ্নি–অন্নজল।

অবিনাশী

শিপ্রা ঘোষ

চলো, একবার আগুন ছুঁয়ে আসি
আগুন জলকে বড় ডাকে–
আগুনে জলে একাকার হলে
আকাশ জুড়ে সেজে উঠবে
বিদ্যুৎভরা মেঘ
নীল ভ্রমরেরা বালকের উত্তরীয় ভিজিয়ে দিয়ে
ঝাঁপ দেবে মেঘলোক থেকে
অমন নীল পতঙ্গ চোখে পড়লে
সর্বনাশ হবে গৃহস্থের ঘরে
চৌকাঠ ভেঙে ঘর যাবে নদীতে
আর তুমি তখন সাগরে সাগরে
লীন হবে–
অবিনাশী এক আত্মস্বরূপ।

অপেক্ষা

জাহাঙ্গীর শেখ
বি.এ. জেনারেল

ফোনটা বাজতেই রিসিভ করল দিশা। ওপ্রান্ত থেকে পুরোনো দিনের হারিয়ে যাওয়া সুজয়ের গলা ভেসে এল –

––আমায় ক্ষমা করে দাও দিশা। আমি আমার সব ভুল বুঝতে পেরেছি। আমি আর কোনো ভুল ....

––Enough সুজয়! অনেক হয়েছে। আমি আর তোমায় আমার জীবনে ফিরিয়ে নিতে পারছিনা।

––আমি আমার ভুল স্বীকার করছি দিশা। আমায় ক্ষমা করে দাও দিশা।

––Please Sujoy its over. আর অনেক দিন আগে তুমিই এই সম্পর্কটাকে শেষ করে দিয়েছো। আর আমি এভাবে একাই সুখে আছি! এখন আমার সব স্বপ্ন আমার 'সানভি'–কে নিয়ে।

––সানভিকে নিয়ে আমারও অনেক স্বপ্ন দিশা। আমিও তো ওর বাবা। ওর জীবনের দায়িত্ব তো আমারও রয়েছে যেভাবে তোমার রয়েছে। ওর জীবনে তো ওর বাবাকে প্রয়োজন দিশা।

––প্রয়োজন ছিলো সুজয় একসময়। এখন আর নেই। আমি নিজেই আমার মেয়েকে এতো বড়ো করেছি সুজয়। যে সময় তোমার প্রয়োজন ছিলো তখন ওকে তুমি নিজে তাড়িয়ে দিয়েছো। সেদিন তুমি আমায় ডিভোর্স দাওনি শুধু, আমার পেটে থাকা সানভিকেও তুমি নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছো। ওর জীবনে তোমার আর কোনো অধিকার নেই। আর কোনোদিন থাকতেও পারেনা।

ভীষণ ভেঙে পড়ল সুজয়। কান্না জড়ানো গলায় বলল––আমায় ক্ষমা করে দাও। আর একটা সুযোগ দাও আমায়। আমি খুব বড়ো ভুল করেছি।

––ভুলটা তুমি করোনি সুজয়, আমি করেছি। তোমায় ভালোবেসে ভুল করেছি। তোমায় বিশ্বাস করে ভুল করেছি।

--অন্ধ ছিলাম দিশা, অন্ধ ছিলাম। রিয়ার ভালোবাসা আমায় অন্ধ করে দিয়েছিলো।

--সুজয় প্লীজ চুপ করো। আমার আর শুনতে ভালো লাগছে না। ফোনটা রাখো।

--দিশা ফোনটা কাটবে না দিশা ... দিশা আমার কথাটা শোনো। তুমি ফোন কাটবে না।

--আমার প্রতি তোমার আর কোনো অধিকার নেই।

--অধিকার আছে, দিশা অনেক অধিকার, আমি তোমার স্বামী।

--ডিভোর্স হয়ে গেছে দুজনের সুজয়। আর এই ডিভোর্সটাও তুমি নিজেই নিয়েছো। আর By the way তোমার সাথে কথা বলার সময় নেই আমার। আর কোনো ইচ্ছাও নেই, আমি ফোন কাটছি।

ফোনটা কেটে দিতেই সুজয়ের মনে আরও আঘাত লাগল। প্রথম থেকেই দোষটা একেবারেই সুজয়ের। অনেক দোষ করেছে সুজয় তবে দিশা ওকে বারবার ক্ষমা করে দিয়েছে। তবে সবাইকে সবসময় এভাবে কেউ সুযোগ দেয়না, তাই এই সম্পর্কটাকে সুজয় আর রাখতে চায়নি নিজেই দিশার থেকে ডিভোর্স নিয়ে নিয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিলো। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানি দিচ্ছিল। তারপরে পরিবেশটা একেবারে মনোরম। একেবারে শান্ত। পাশের মন্দিরে বেশ কয়েকবার ঘন্টা শোনা গেল। আর তার কিছুক্ষণ পরেই মসজিদ থেকে ভেসে এল মগরীবের আজান। সময়টা দেখল সুজয়। সন্ধ্যাটা খুব তাড়াতাড়ি নেমে গেছে। আসলে শীতের সন্ধ্যে তো, বিকেল নামতে না নামতেই সন্ধ্যা যেন ওকে গ্রাস করে ফেলে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সুজয়। চোখ পড়ল পুরানো বট গাছটার দিকে। দেখে আরও বেশী ভালোবাসা জেগে উঠল মনে দিশার জন্য। এই গাছের সাথে ওদের জীবনের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। গাছের নীচে কাউচটা তখনও একইভাবে রয়েছে। একসময় এই কাউচে বসে থাকত দুজন একসাথে। ঘরে আর বসে থাকতে পারল না সুজয় নীচে নেমে এলো। ঘাসে ঘাসে তখনও বৃষ্টির বিন্দুগুলো জমাট বেঁধে আছে। গাছের পাতাগুলো একেবারে সদ্য ভিজে। কাউচটা রুমাল দিয়ে মুছে তার এককোণে বসল সুজয়। দূরে বড়ো বড়ো ঝাউ আর বেশ বড়ো বড়ো ইউক্যালিপটাস-এর ঘেরা জঙ্গল। আর যেন তার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোটা এত

মনোরম, নীরব যে সুজয়ের মনে হল ওর দুঃখে, চাঁদও দুঃখিত। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে এল। তার সাথে কান ঝাঁঝানো ঝিল্লি পোকার ঝি ঝি শব্দ। উত্তরের আলতো ফুরফুরে হাওয়ায় হাল্কা ঠান্ডা অনুভব হল। নিজেকে একটা অপরাধী বলে মনে হল। সানভির কথাটা মনে পড়তেই মন আরও ভেঙে গেল। সানভি আজ ওকে বাবা বলে ডেকেছে। আর তার সাথে সুজয়ের হৃদয়ে একটা বড়ো আঁচড় কেটে দিয়েছে যেটা সানভি ছাড়া কেউ সারাতে পারবেনা। কেউ না, এতদিনের পরও দিশা সুজয়কে ভোলেনি। নাহলে সানভি চিনবে কীভাবে ওর বাবাকে? যখন ওদের ডিভোর্স হয়েছিলো সানভি তখন পেটে। তবুও দিশা সানভিকে ওর বাবাকে চিনিয়েছে। নিজের বুকে যেন হাতুড়ি ঠোকার শব্দ পেল সুজয়। পুরোনো অতীতটা চোখের সামনে যেন বর্তমান হয়ে আসছে। দুজনের প্রথম দেখা হওয়া। প্রেম হওয়া, বিয়ে হওয়া আর এত কিছুর পর সুজয় অন্য নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে এতদিনের ভালোবাসা, সম্পর্ক সব ভুলে গিয়ে দিশাকে ডিভোর্স দিয়ে রিয়ার হাত ধরে নেয়। সেদিন দিশা সুজয়ের পায়ে ধরে কেঁদেছিলো। ওর পেটে থাকা সানভির জন্য। কিন্তু সুজয় কোনো কথা শোনেনি। বেদনার্ত চোখটা বন্ধ করে নিলো সুজয়। সব ভুলতে চাইল, পারল না। চোখ বুজে দেখতে পেল ওর মেয়ে সানভি বলছে বাবা তুমি একটা পাপী। তুমি অপরাধী। আমাকে আমার মাকে তুমি কষ্ট দিয়েছো, তুমি খুব খারাপ। দিশা বলছে চলে যাও ধোঁকাবাজ কেন এলে আবার? সব কিছু কেড়ে নিয়ে শান্তি হয়নি? আবার আমার মেয়েকেও কেড়ে নিবি শয়তান? বেরিয়ে যা।

না–না–না দিশা না– চিৎকার করে উঠল সুজয়। ভীষণ ভেঙে পড়ল। ডুকরে কেঁদে উঠল। কষ্ট যেন গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে আছে। বলে উঠল––হ্যাঁ সানভি আমি পাপ করেছি মা। আমায় একবার সুযোগ দে মা আমি তোর আদর্শ বাপ হব। তোর সব ইচ্ছা পূরণ করব। তুই আমায় ছেড়ে যাসনা। আমি একা হয়ে যাব। আমার সব শেষ। আর কিছু চাই না। তুই একবার আমায় বাবা বলে ফিরে আয় আমার কাছে।

শীতটা আরও বেড়ে চলল। চাঁদটা এখন বেশ পরিষ্কার। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকটা এখন একটু স্তব্ধ। ঝাউ গাছের মাথাগুলো এবার স্পষ্ট হয়েছে। বটগাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। সামনের পুকুরে টুপটুপ শব্দ হচ্ছে। মনে হল কচু পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে। চারদিকটা যেন চাঁদের আলোয় এক সোনালী আবরণ ধারণ করেছে। যেন কেউ পৃথিবীটাকে সোনালী চাদরে ঢেকে দিয়েছে। আর একমাত্র সাক্ষী হিসেবে সুজয় তখনও বাগানের কাউচে বসে রয়েছে। আর বসে থাকতে পারল না স্থির হয়ে।

মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওর দিশাকে দরকার, সানভিকে দরকার। আর কিছু চাইনা ওর। এই এত সুন্দর পরিবেশেও ওর মন উতলা হয়ে উঠেছে। হেঁটে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে এল সুজয়। এত শীতেও ওর মাথায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। ভীষণ চিন্তিত। থাকতে না পেরে ফুটে নেমে এলো। দোকান থেকে একটা মদের বোতল কিনে নিল। পাকা রাস্তাটা শুকনো হয়ে গেলেও সাইডগুলো তখনও ভিজে। রাতটাও বেড়ে চলেছে। ল্যাম্পপোস্টে এসে হেলান দিয়ে বসল। মনের দুঃখ জ্বালা মেটানোর জন্য বোতলটা উজাড় করে নিলো। কিছু হল না। জ্বালা কমল না। বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। চোখ বন্ধ করে নিলো। সব মুছে যাওয়া দিনগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে দিশাকে, রিয়াকে সব কিছুকে। দিশা যখন জানতে পারে যে সুজয়ের সাথে রিয়ার সম্পর্কটা দিশা খুব রেগে গিয়েছিলো। ঝগড়াও হয়েছিলো। তবে সুজয় নানা কথায় ওর মন গলিয়ে বলেছিলো যে, যেটা দিশা পছন্দ করেনা আর কোনোদিন সুজয় সেটা করবে না। তবে এরপর যে সুজয় বদলায়নি তা জেনে দিশা বিচার চায়। তাতে সুজয় দিশাকে ডিভোর্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সানভি দিশার পেটে। দিশা সেদিন পা ধরে কেঁদে ছিলো সুজয়ের। সানভির জন্য ওর ভবিষ্যতের জন্য। সুজয় তাতে কোনোমতেই মেনে নেয়নি। বলেছিলো---যদি তোকে না ডিভোর্স দি তাহলে রিয়াকে বিয়ে করব কীভাবে এটা তো আইনত অপরাধ।

---আর এটা কী অপরাধ নয় সুজয়? যে বাচ্চাটা পৃথিবীর আলো দেখেনি তাকে রেখে এভাবে চলে যাওয়া উচিত? ওর জীবনে ও তো ওর বাবার প্রয়োজন সুজয়। তুমি চলে গেলে ওর কী হবে?

---মরে যাক। I don't Care.

এরপর দিশা আর কোনো কথা বলেনি। যে সন্তান এখনও পৃথিবীর আলো দেখেনি সেই সন্তানকে মরে যেতে বলল মায়ের কাছে এর থেকে বড়ো আঘাত আর কিছুই হতে পারে না। তাই মুক্ত করে নিলো নিজেকে আর ওর মেয়ে সানভিকে।

সন্ধ্যা যে গড়িয়ে রাতটা অনেকক্ষণ আগেই এসে গেছে। সেটা নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। কুয়াশাতে ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক। মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল সুজয়। পারলো না। উঠে দাঁড়ালো এবার। ফোনটা বের করে দিশাকে কল করল। ধরল না। আবার করল, ধরল না। এভাবে পাঁচবার করার পর দিশা রিসিভ করে বলল–

---কী চাও সুজয়? কেন করছো?

---শেষবারের মতো দেখা করবে?

---পারবো না সুজয়।

---একবার। আমি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। মাত্র একবার। সুজয় এরপর নিজেই ফোনটা কেটে দিলো। আবার বাসস্টপে বসে রইল।

প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করল। দিশা এলোনা। ফোন করল ধরল না। আরও আধঘন্টা, না দিশা এল না। আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা হল না সুজয়ের। উঠে মেন রোডে চলে এলো। চেঁচিয়ে বলতে লাগল দিশা, ক্ষমা করে দাও আমায়। জীবনে অনেক ভুল করেছি দিশা অনেক পাপ করেছি। আমায় সানভির থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা। আমি একটা আদর্শ বাবা হতে চাই, ফিরে এসো দিশা, ফিরে এসো। আমায় ক্ষমা করে দাও। আমি সবকিছু ফেলে চলে এসেছি। সানভির জন্য, তোমার জন্য। ফিরে এসো একবার।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা বাজে। দিশা এত রাতেও নিজেকে পুরোপুরিভাবে ঢেকে নিলো। সানভিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ। দরজা ঠেলে নীচে নেমে এলো। বাইরে ঘন কুয়াশা। ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলোও কুয়াশায় অপরিষ্কার ধোঁয়ার জমাট বেঁধে মুছে গেছে। রাস্তার ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করল দিশা। বাসস্ট্যান্ডে এসে কোথাও সুজয়কে দেখতে পেলনা। দু-তিন বার সুজয়ের নাম ধরে ডাকল সাড়া পেল না। এবার দিশা মেন রোডে নেমে এলো। বারবার ডাকল সুজয়, সাড়া পেল না। দূর থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনে খুব চেনা মনে হল। ছুটে এলো সেইদিকে। উৎসস্থলের কাছে এসে দেখল সত্যি এ তো সুজয়। ওকে পুলিশে ধরেছে? কেন? কাছে এলো দিশা। সুজয় তখনও চিৎকার করছে দিশা আমায় ক্ষমা করে দাও দিশা। আমায় ক্ষমা করে দাও। দিশা ওকে পুলিশের থেকে ছাড়াল। এত রাতে মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করলে পুলিশ ধরাটাও স্বাভাবিক।

---বলো সুজয় কী জন্য ডাকলে?

সুজয় দিশার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলল---দিশা ক্ষমা করে দাও। আমি ভুল করে ছিলাম। আমি সানভির বাবা হতে চাই। আজ ও আমায় বাবা বলে ডেকেছে। আমি জানি তুমি আজও আমায় ভালোবাসো। আমায় মেনে নাও। সানভিকে আমার থেকে দূর কোরো না। আমি সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছি। তোমার জন্য, আমার মেয়ে সানভির জন্য।

--আর কী এটাই দেখার মতো বাকি ছিলো সুজয়? আর কোনোদিন কাউকে বোলো না যে তুমি আমার স্বামী। ফিরে যাও সুজয় ফিরে যাও।

--এমন কোরো না। অনেকদিন বাদে এসেছি তোমার কাছে ফিরিয়ে দিওনা।

--আমি মানলেও সমাজ মানবে না সুজয়।

--কেন মানবে না? আমরা আবার বিয়ে করব।

--সুজয় আমায় বোঝার চেষ্টা কর। আমি ...

--চুপ একদম চুপ আর কোনো কথা নয়।

--সুজয় ফিরে যাও সুজয়। আমি সমাজের কলঙ্কিত নারী। আমি খারাপ মেয়ে হয়ে গেছি সুজয় পরিস্থিতির চাপে। সানভির ভবিষ্যতের জন্য ফিরে যাও। এই খারাপ চরিত্রের দিশার নাম নিজের নামের সাথে আর জড়িও না। আমি খারাপ সুজয়। আমি নষ্ট। চলে যাও। কেঁদে ফেলল দিশা।

সুজয় কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর দিশার হাত ধরে বলল, বহু কষ্টে ফিরে এসেছি দিশা। একা ফিরে যাব না। আমি তবুও তোমায় ভালোবাসি। আমি দূরে কোথাও চলে যাব। কাল ভোরে আমি তোমার আর সানভির জন্য এই বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করব।

--প্লিজ ফিরে যাও সুজয় ফিরে যাও। নিজের গায়ের শালটা সুজয়ের গায়ে ভালোভাবে জড়িয়ে দিলো। পিছনে ফিরে বলল, ফিরে যাও সুজয়। আমি চরিত্রহীন মেয়ে। পিছনে দৌড় লাগাল দিশা।

সুজয় একবার চিৎকার করে বলল, আমি কাল ভোরে এই বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করব। আমার বিশ্বাস তুমি সানভিকে নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি এই প্রতীক্ষায় রইলাম তুমি আবার আমার জীবনে ফিরে আসবে।

একাকী অন্তহীন

সৌমিকা সরকার
প্রথম বর্ষ (জুওলজি)

--টুবলুটা দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে গেল জানো? শিশিরমঞ্চে থিয়েটার করে, গল্প-কবিতা লেখার শখ, না ঠিক শখ নয়, নেশার মতো। বলি পড় একটু, সামনে ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা। কে শোনে কার কথা। ঠিক ওর বাবার মতো হয়েছে। খামখেয়ালি, জেদী, রগচটা, আমাকে খুব ভালোওবাসে, শুধু একটাই তফাৎ। হোস্টেলে থাকলেও রোজ আমার খোঁজ নেয়, খবর নেয়, আর আমার ওষুধের টাইম-টেবিল তো ওর ঠোঁটস্থ একদম। একটু এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই, হা হা হা।

--আচ্ছা তৃণা দি, তোমাদের তো ডিভোর্স হয়নি না?

--কাগজে কলমে না। প্রেম আর দাম্পত্য অনেকটা কেমন জানো তো? তোমার প্রিয় গল্পের বই আর আরেকটা দুর্বোধ্য স্টাটিস্টিক্স-এর পাঠ্য বই এর মত। দাম্পত্য ব্যাপারটা আসলে যে কি সেটাই বুঝে উঠতে পারতাম না।

ভাস্করের সাথে আলাপ হয় কলেজে, খুব সুন্দর গল্প লিখতে পারতো, আবৃত্তি করতে পারত। গানের গলাও বেশ ভালোই। বেশ ভালো লাগতো আমার ওকে তখন, এখনও লাগেনা তাও নয়। তবে ঐ যে, আর ফিরে যাওয়ার মতো না আছে মনের জোর, না আছে ভরসা। আমি জানি সেও মনে মনে ভালোবাসে এখনো, বিয়েটিয়ে আর করেনি, ডিভোর্সের কথা আমিই তুলেছিলাম, ও উত্তর না দিয়ে চলে গেল। আর ফিরে গেলেই কি লাভ, সেই আগের মত ঝগড়া-ঝাটি, মনোমালিন্য, বারবার বাড়ি থেকে চলে যাওয়া। এর থেকে বেশ আছি সুচনা। বেশ আছি। বিট্টুকে স্কুলে দিয়ে এলে? কোন ক্লাসে উঠল যেন?

--এই তো ফোর-এ। এই কয়েকঘন্টা পার্কে এসে যেন একটু অক্সিজেন পাই বিশ্বাস করো। সারাদিন কেমন একটা ঘোর লাগে, সেই এক জিনিসের রোজ রোজ পুনরাবৃত্তি! সিরিয়ালগুলোও রোচে না, খবর দেখলেও বিট্টুর বাবার আড়ালে দেখতে হয়। একদিন ক্লিনিক থেকে বাড়ি ফিরে দেখে চিকিৎসা না ব্যবসা শোটা দেখছি, কি রেগে গেল বাপরে বাপ।

--এক্সপ্লয়টেশন এর নিত্যতা সূত্রে মেনেই তো চলছে দুনিয়াটা। সবাই কোনো

না কোনো দিক থেকে আক্রান্ত।

--ভাস্করদার সাথে কথা হয় আর?

--নাহ, সোজাসুজি হয়না, তবে খোঁজ-খবর পেয়ে যাই। সেও আমার খোঁজ-খবর রাখে। আমার এক বন্ধুর সাথে তার যোগাযোগ আছে, তাকে দিয়ে আমায় বলা হয়েছিল আমি যেন আবার নতুন করে সংসার শুরু করি, নতুন জীবন শুরু করি। ভেবেছিলাম অনেকবার সেটা অবশ্য। কিন্তু নতুন করে শুরুর ব্যাপারটা কেমন একটা ক্লিশে লাগে আমার। যা শুরু হওয়ার তা একচল্লিশ বছর আগেই হয়ে গেছে, সেটা শেষ হবে আমার নিঃশ্বাসের সাথে সাথেই। মাঝে যা ঘটবে তা তো এই জীবনেরই অংশ, নতুন করে কিভাবে শুরু করা যায়।

--একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ডোন্ট মাইন্ড, টুবলুর পড়াশোনার ...

--দিতে চেয়েছিল, ইন ফ্যাক্ট, আমার সংসারের সব খরচই দিতে চেয়েছিল। নিতে বড্ড আত্মসম্মানে লাগল, যে মানুষটা আমার মনের কাছে নেই, তার কাছে হাত পেতে টাকা নেওয়াটা কেমন একটা দয়ার দান বলে মনে হয়। সংসার চলে বাবার জমানো বেশ কিছু টাকায়। আমি একমাত্র মেয়ে, বাবা-মা মারা গিয়েছেন। সমস্ত কিছু টুবলুর নামেই, আমি কিছুই নিইনি।

--ভয় লাগেনা? টুবলুর বিয়ের পর যদি ...

--আর কিছুতেই ভয় লাগেনা, তবে ওর উপর একটু ভরসা আছে। আর ওর এসব টাকায় কোনো মোহ-মায়া নেই, ও চায় নিজের রোজগারে আমায় রাখতে, নিজের শখ আহ্লাদ মেটাতে। ঠিক ওর বাবার মতো। আমায় ছেড়ে চলে গেলেও এখনো বৃদ্ধা মাকে ঠিক যত্নে রেখেছে। তাই টুবলুর উপর ভরসার এইটুকুই যুক্তি। মানুষটাকে খারাপ বলছি না, শুধু আমার থেকে অনেক আলাদা। ওর সাথে প্রেম করা যায় মন খুলে, আজীবন প্রেম করা যায়। সংসার করার জন্যে ও নয়।

--তা এখন ভাস্করদা কী করছেন?

--কয়েকটা শর্ট ফিল্ম তৈরি করার পর এখন যতদূর জানি সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখায় ব্যস্ত। ফটোগ্রাফির শখ হয়ত আর নেই তার। ফেসবুকে ওর লেখা আমি পড়ি, টুবলুও পড়ে। শুধু এটাই তফাৎ যে আমি লেখাগুলো পড়ে সেভ করে রাখি আর টুবলু ডিলিট করে দেয় ওয়াল থেকে।

--কেন? তাহলে ব্লক করেই দেয়না কেন?

---সেটা ওই জানে, তবে বললাম না, গল্পগুলো না পড়ে ডিলিট করে না, বেশ মন দিয়েই পড়ে।

প্রেম কতকটা ঠিক অনুঘটকের মতো বুঝলে, আসে, অনেক কিছু বদলে দেয়, তারপর চলে যায়। সারাজীবন টেকার বস্তু সে নয়! সময়ের সাথে সাথে আমরা অনেক সময় দায়িত্ব, অভ্যেস এগুলোকে প্রেম বলে ভুল করে ফেলি।

ছেলেটা তখন ক্লাস ফোরে পড়ে। ঠিক তোমার বিট্টুর মতো। ভাস্কর চলে যায় ওর রাস্তায়, আমি পড়ে থাকি মোড়ের ফুটপাথে। ছেলেটা যখন জিজ্ঞেস করতো বাবা কোথায়? এখনো ফিরছে না কেন? বলতাম, যুদ্ধে গেছে, বিশাল বড় যুদ্ধ। কত ঘোড়া, হাতি, কামান, বন্দুক আছে সেখানে। শুনে পাগলটা বলত সেও যাবে। ভয় করত তখন খুব। যদিও জানতাম ওগুলো বাচ্চা ফুটফুটে মনের কল্পনা।

---কটা বাজলো দেখো তো একবার?

---সাড়ে তিনটে, কি আরেকটু বসবে? চারটে অবধি খোলা আছে তো।

---নাহ গো, ছেলেটা আজ আসবে। বাড়ি তো ভাগাড় হয়ে পড়ে আছে। গুছাতে হবে। ওর ফেভারিট ডিশ বানাতে হবে। এই বলছি তুমিও একদিন এসো না আমার বাড়িতে, জমিয়ে গল্প করা যাবে।

---হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবো, এই তো বিট্টুর এবার গরমের ছুটি পড়ছে।

---তাহলে বিট্টুকেও নিয়ে এসো। আমার খুব ভালো লাগবে। সময় করে একদিন এসো কিন্তু। আর হ্যাঁ, রাতের ডিনার না করে কিন্তু যাওয়া যাবে না।

---অবশ্যই যা[illegible] আমি আজ চারটে অবধি এখান থেকে নড়ছি না। সাবধানে যেও, টা-টা।

তৃণা চলে যাওয়ার পর সে ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করলো। তারপর তৃণার প্রাক্তন স্বামী ভাস্করকে ফোন করলো।

---হ্যাঁ, ভাস্কর দা? এইমাত্র তৃণাদি পার্ক ছেড়ে বেরোল।

---ও আচ্ছা, তৃণার ছবিটা লুকিয়ে তুলতে পেরেছ তো?

---ঠিকঠাক, প্রতিদিনের মতো। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

---তোমায় যে কি বলে ধন্যবাদ দেব বোন, আচ্ছা ও কী কী বলল আজ? আমায় নিয়ে কিছু বলছিল?

প্রিয় বন্ধু

তথাগত ব্যানার্জী
বি.এ. ফার্স্ট ইয়ার

আমি নতুন স্কুলে ভর্তি হলাম। প্রথমদিন সবই নতুন মুখ, কারো সঙ্গে পরিচয় হয়নি। একটা ছেলে হঠাৎ আমার পাশে এসে বসলো, আমি বুঝতে পারলাম ও একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেই আমি ওর দিকে তাকালাম ও সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। ক্লাসে ম্যাম ঢুকে আমাকে নতুন দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। তারপর পাশের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বললেন উজ্জ্বল তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় হয়নি, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নাও। দেখলাম ছেলেটার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হঠাৎ ও আমার একটা হাত টেনে নিয়ে বললো, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু কেমন। আমি হেসে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সেই থেকে উজ্জ্বলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওর থুতনির পাশে বড় কালো একটা তিল। হাসলে ওকে খুব ভাল দেখায়। প্রতিদিন মা আমাকে ভালো ভালো টিফিন দিয়ে দিতেন। টিফিনের সময় টিফিন খেতে খেতে দেখলাম পাশে উজ্জ্বল নেই, পরের দিনও দেখি টিফিনের সময় উজ্জ্বল নেই, তারপর জানতে পারলাম ও একটা গাছের নিচে চুপ করে বসে আছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি টিফিন আনোনি, ও নীরবে মাথা নাড়লো, বুঝলাম আমরা যখন টিফিন খাই তখন গাছের নিচে বসে থাকে। তাই মা প্রতিদিন বেশী করে টিফিন দিতেন। তারপর আমরা টিফিন ভাগ করে খেতাম। একদিন দেখি খুব সংকোচের সঙ্গে একটা ক্যাডবেরি দিল। সে বলল, আমার মা তোমাকে দিতে বলেছে। আমি খুশী হয়ে ক্যাডবেরিটা খেয়ে খুবই আনন্দবোধ করলাম, সেও খুব আনন্দ পেলো। হঠাৎ একদিন দেখি উজ্জ্বল আসেনি। একদিন যায়, চারদিন যায়, উজ্জ্বল আসে না, একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, উজ্জ্বল আসেনি কেন, ও বলতে পারলো না। পরেরদিন স্কুলে এসে ম্যাম বললেন, তোমাদের উজ্জ্বলের ক্যানসার হয়েছে। আমি ভিতরের কান্নাটার শব্দরোধ করতে লাগলাম, তারপর কেঁদে ফেললাম। পাশের ছেলেটি বললো ম্যাম ও খুব কাঁদছে। ম্যাম বললেনি কেন তোমার শরীর খুব খারাপ লাগছে? না ম্যাম উজ্জ্বলের খুব ভালো বন্ধু ছিল। তাই। ম্যাম বললেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর উজ্জ্বল যেন সুস্থ হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসে। বাড়িতে যখন ফিরলাম মাকে বললাম কিছু খাবো না

ভালো লাগছে না। তোর কী শরীর খারাপ। কেঁদে বললাম উজ্জ্বলের ক্যানসার হয়েছে। ওর পায়ে কী হয়েছে ডাক্তাররা কিছু ধরতে পারছে না। পরের দিন স্কুলে গিয়ে ম্যাম বললেন, ওর বাবা ধূপ বেচে সংসার চালায়, তোমরা কিছু অর্থ সাহায্য কর। উজ্জ্বল হাসপাতাল থেকে যখন বাড়ি ফিরল তখন সে ফ্যাসফেসে গলায় বললো দেখা করতে। আমার খুবই ইচ্ছা ছিল উজ্জ্বলের কাছে যেতে কিন্তু অসুস্থ হওয়ার কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পরের দিন যখন ক্লাসে গেলাম তখন ম্যাম বললেন, উজ্জ্বল মারা গিয়েছে। শোকসভা হল, ছেলেরা ভুলে গেল। হঠাৎ দেখলাম উজ্জ্বল যেখানে বসে থাকত সেখানে অন্য একটি ছেলে বসে আছে। স্কুলে গেলে আমার একটুও ভালো লাগত না। এক--দু'বছর এমনি করেই চলে গেলো। এর মধ্যেই আমাদের বাড়িতে ছোট্ট একটি নতুন অতিথি এসেছে। আমার ভাই।

হঠাৎ একদিন ভোরবেলা আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম যে উজ্জ্বল আমার পাশে বসে আছে আর বলছে বন্ধু তুমি দুঃখ পেয়েছো, আমি জানি তাই আমায় আবার ফিরে আসতে হবে। তখন বন্ধু হবো না দুই ভাই হবো কেমন। মাকে বললাম ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয়? মা বললেন কি জানি? পরের দিন দেখলাম থুতনির পাশে একটা তিল, তাই আমার মনে বিশ্বাস হল সত্যি তো ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। তাই আজ আমার কোনো বন্ধু নেই। তাই ভাই আমার বন্ধু।